সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০১৮

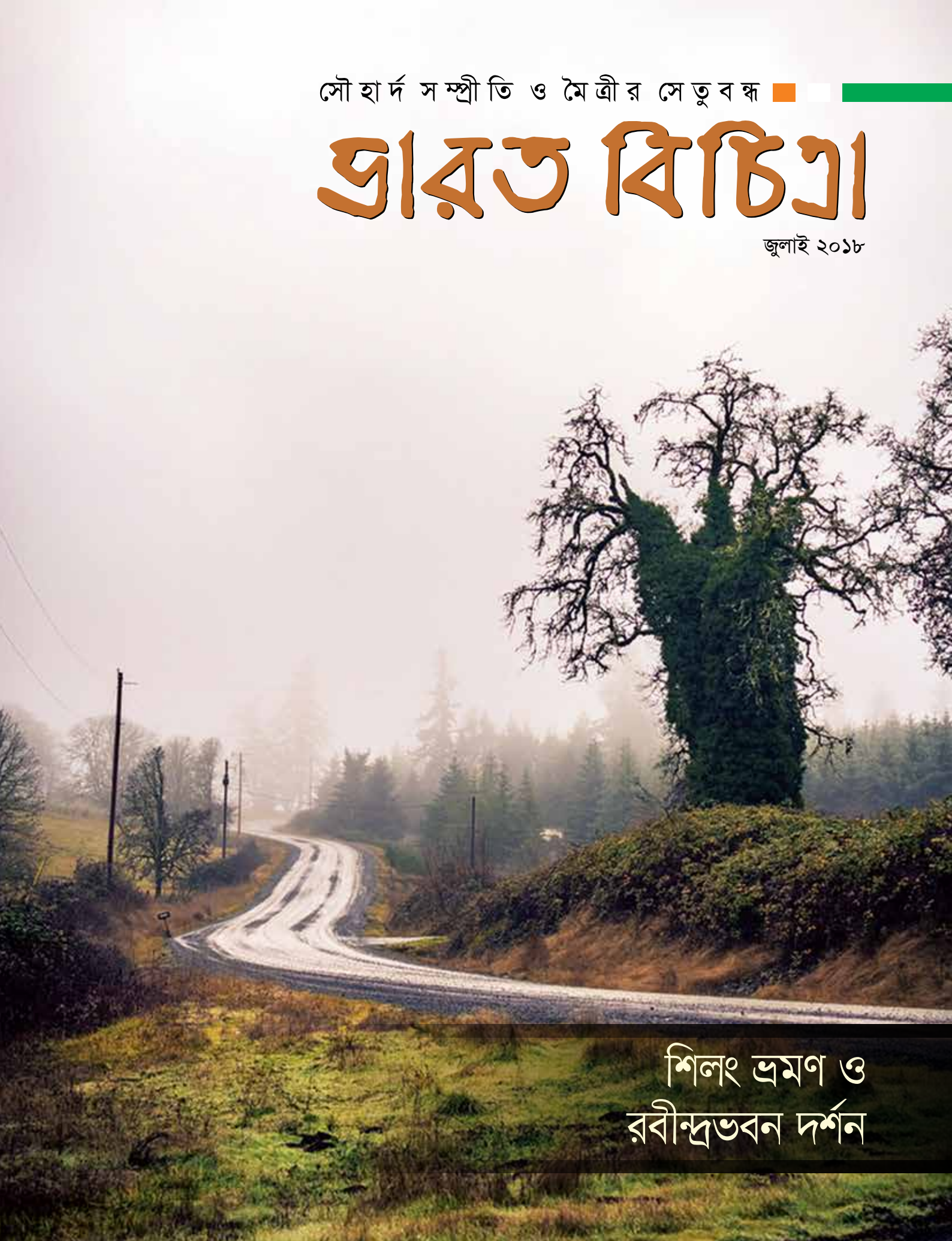

শিলং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রভবন দর্শন

ঈদমোবারক!
১৬ জুন ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার
বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে
ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা
বিনিময়

ঈদ মোবারক!
একই দিনে হাই কমিশনার
শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে
ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা
বিনিময়

১৪ জুন ২০১৮ হাই কমিশনার
শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও ডেপুটি হাই
কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকার সঙ্গে
বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ড এবং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের
সভাপতি ও সদস্যদের সাক্ষাৎ

বন্ধুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ
সবসময়ই আনন্দদায়ক!
০৪ জুন ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার
সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের
সানন্দ সাক্ষাৎ

১৮ জুন ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার
বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক
হাসিবুর রেজা কল্লোলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
জনাব কল্লোল তাঁর নতুন ছবি *মন্দছবি*-র
কাজ করছেন এখন, যাতে ভারত-বাংলাদেশ
উভয় দেশের শিল্পীরা
অভিনয় করছেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ০৭ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৫ | জুলাই ২০১৮

High Chommission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

যোগ কেবলি যোগ নয়...

পৃষ্ঠা: ৩৭

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্টে ভর্তির সুযোগ ০৪
ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত ০৫
ভারতীয় হাই কমিশনে ইফতার আয়োজন ০৭
নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল সুনীল লানবার ঢাকা সফর ০৮

শিক্ষা বৃত্তি — মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম ০৯

নিবন্ধ — বহু সংস্কৃতির ধারা বয়ে যায় ভারতে জেতা সাংকৃত্যায়ন ১০
আমার কলেজের ছেলেদের মারবি? শুভাশিস চক্রবর্তী ১২
বেদে সর্বোচ্চ নম্বর, তবু ক্লাসের বাইরে... সুনন্দনকুমার সেন ১৪
ঠিক যেন যৌথ পরিবারের বড়দা... ১৬
কৃষ্ণচরিত্রের সহজ পাঠ ॥ গাজী আজিজুর রহমান ৩৮

প্রবন্ধ — বহুমাত্রিক মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ ॥ রেফুল করিম ১৮

অনুবাদ গল্প — জোয়ার-ভাটা ॥ গৌরী দেশপাণ্ডে ২১

কবিতা — শেখ সামসুল হক ॥ খোশনূর ॥ সামসুন্নাহার ফারুক রীনা তালুকদার ২৪ রোকেয়া ইসলাম ॥ সরকার মাসুদ কনক চৌধুরী ॥ হাসান হাফিজ ২৫

ছোটগল্প — রমাকান্তর প্রেম ॥ তৃপ্তি বালা ২৬

ভ্রমণ — শিলং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রভবন দর্শন ॥ তপন চক্রবর্তী ৩০

যোগ — যোগ কেবলি যোগ নয়...॥ মেহরীন ৩৭

রাজ্য পরিচিতি — কর্নাটক ॥ জি কে ঘোরি ৪১

হেঁসেলঘর — কর্নাটকের সেরা ১০টি প্রথাগত থালি ৪৬

শেষ পাতা — রজনীকান্ত সেন ৪৮

পৃষ্ঠা ৩০

শিলং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রভবন দর্শন

শিলং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী। ইউরোপীয় শাসকেরা একে প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড বলতেন। পাশ্চাত্যের স্কটল্যান্ড দেখার সুযোগ আমার হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা ছিল কিন্তু "ঘর হতে দু'পা ফেলিয়া, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া"। শিলং ভ্রমণের অপর একটি বড় কারণ, শিলংয়ে বিশ্বকবির বাসভবন চাক্ষুষ করা। যে ভবনে বসে কবি তাঁর অমর উপন্যাস *শেষের কবিতা* ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক *রক্তকরবী* লিখেছিলেন। কৌতূহল ছিল, রবীন্দ্রনাথ কেন বার বার শিলং যেতেন। তিনি ১৯১৯, ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে শিলং গিয়েছিলেন। তখন কলকাতা থেকে শিলং পর্যন্ত কোন বড় সড়ক ছিল না। সড়ক যেটুকু ছিল তা দিয়ে উন্নতমানের কোন যন্ত্রযান চলত না। ভারতীয় রেলওয়ে সে-সময় আসামের বর্তমান রাজধানী গৌহাটি পর্যন্ত রেল লাইনেরও সম্প্রসারণ ঘটায়নি। কবি সম্ভবত ব্রহ্মপুত্র নদ বেয়ে স্টীমারে গৌহাটি যেতেন।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

গলদটা গোড়ায় না শেষে

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন *ভারত বিচিত্রা*। পড়ে সমৃদ্ধ হই। নিয়মিত পেলে আরও ভাল লাগত। মার্চ, ২০১৮ সংখ্যা *ভারত বিচিত্রা* হাতে পেয়েছি মে, ২০১৮-য়। এরপর কোন পত্রিকা পাইনি টানা ৪ মাস। উল্লেখ্য,পত্রিকা প্রকাশের দু'মাস পর করে হাতে পাই। জানি না গলদটা গোড়ায় না শেষে। বিবেচনায় নেবেন। কৃতজ্ঞতা জানাই *ভারত বিচিত্রা* পরিবারকে।

শামসুজ্জামান নয়ন
বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-৫/৩
ধাপ ভগিলেন, সিটি কর্পোরেশন
রংপুর-৫৪০০

প্রকাশনায় মুগ্ধ

ভারত বিচিত্রা অসাধারণ একটি দেশকে জানার বড় মাধ্যম। পৃথিবীর অন্যতম একটি দেশের নাম ভারত। ভারত সম্পর্কে জানতে হলে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গী হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। অপেক্ষায় প্রহর গুনি কখন আগামী সংখ্যাটি হাতে পাব। হাতে পেলে মুহূর্তের মধ্যে পড়ে ফেলি। পরবর্তী সংখ্যা পাওয়ার আগ পর্যন্ত নিত্যদিন ঐ সংখ্যাটিকে হাতের কাছে রাখি। কারণ ভারত বিচিত্রার লেখাগুলো লোম শিহরে উঠায়। *ভারত বিচিত্রা* এপ্রিল-২০১৮ সংখ্যাটি হাতে পেলাম। অসাধারণ কিছু লেখা দিয়ে তৈরি হওয়া এ সংখ্যাটি ভীষণ ভাল লাগল।

ভাল লাগল রাজ্য পরিচিতি পর্বে অন্ধ্র প্রদেশ নিয়ে প্রকাশনা, নববর্ষ-১,২,৩, কবিতাগুচ্ছ, ভ্রমণ পর্বে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম গ্রাম, সৌহার্দ-১,২,৩,৪, সম্পর্ক পর্বে ভারত বাংলাদেশের আলোচনায় বিদেশ সচিবের বক্তব্য, রান্নাঘর, শেষপাতা, শিক্ষাবৃত্তি, প্রবন্ধ পর্বে এমিলি জামানের কমলকুমার মজুমদার ও একটি অনন্য দ্যুতিময় সাহিত্যকর্মসহ সকল আয়োজন দারুন ভাল লগল। এত সুন্দর প্রকাশনা দিয়ে প্রকাশিত এ সংখ্যাটি আমাকে মুগ্ধ করল। খেলোয়াড় পরিচিতি নামে একটি পর্বের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজিনুর রহমান লিমন
গ্রাম ও ডাক: গৌরীপুর বাজার,
উপজেলা: দাউদকান্দি,
কুমিল্লা

অনিন্দ্যসুন্দর

বাংলাদেশ সংস্কৃত পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অফিস কর্তৃপক্ষ নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ও পেতে ইচ্ছুক। এটি চমৎকার একটি পত্রিকা। তথ্যসমৃদ্ধ হতে চাই বলে এর প্রতিটি সংখ্যা আমাদের পড়া দরকার। এই অনিন্দ্যসুন্দর পত্রিকাটি আমাদের ঠিকানায় পাঠালে বাধিত হব।

অসীম চৌধুরী উপ-সচিব
বাংলাদেশ সংস্কৃত পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার চত্বর, অতীশ দীপংকর সড়ক
বাসাবো ঢাকা-১২১৪

সবিশেষ আগ্রহী

আমি ইসমাইল মাহমুদ শ্রীমঙ্গল প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি, দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের পত্রিকাটি দেখি, মাঝে মাঝে বন্ধুর সৌজন্যে পড়ার সুযোগ পাই। আমার বর্তমান ঠিকানা– ইত্যাদি স্টেশনারি, স্টেশন রোড (চৌমুহনা), শ্রীমঙ্গল-৩২১০। আমি আপনার সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভারতের সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা*র প্রকাশিত সংখ্যাগুলো ডাকযোগে পেতে সবিশেষ আগ্রহী।

অতএব নিবেদন আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত *ভারত বিচিত্রা* আমার প্রদত্ত ঠিকানায় প্রেরণ করে কৃতার্থ করবেন।

ইসমাইল মাহমুদ সিনিয়র সহ-সভাপতি
শ্রীমঙ্গল প্রেস ক্লাব, ইত্যাদি স্টেশনারি, স্টেশন রোড
(চৌমুহনা), শ্রীমঙ্গল-৩২১০

গবেষণামূলক হওয়ায়

ভারত বিচিত্রা গবেষণামূলক হওয়ায় তা পড়ে আমি ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তা ছাড়া, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল থাকায় ভারতকে ভালভাবে জানার জন্য *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পড়া আবশ্যক। তাই সবসময় এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই। আমাকে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সবসময় সংযুক্ত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

কাজী নেয়ামুল শাহীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
সরকারি খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর, খুলনা-৯০০০

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুলাই

০১ জুলাই ১৮৮২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২	❖	স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু বেলুড় মঠে
০৭ জুলাই ১৯০৫	❖	প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪	❖	রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩	❖	কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮	❖	অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম গুজরাটে
১০ জুলাই ১৯০৯	❖	কবি বিষ্ণু দে-র জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৯৯	❖	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর জন্ম
১৯ জুলাই ১৮৬৩	❖	কবি-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২	❖	কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪	❖	প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩	❖	গায়ক মুকেশের জন্ম লুধিয়ানায়
২৪ জুলাই ১৯৮০	❖	উত্তমকুমারের মৃত্যু
২৬ জুলাই ১৮৬৫	❖	রজনীকান্ত সেনের জন্ম পাবনায়
৩১ জুলাই ১৮৮০	❖	মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

ঢাকায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

২১ জুন ২০১৮ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রায় ১০,০০০ মানুষের অংশগ্রহণে প্রাচীন ভারতীয় যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আইজিসিসি ও ঢাকার বিভিন্ন যোগ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যোগাসন প্রদর্শন, গণ যোগ সেশন ছাড়াও লাকি ড্র-র ব্যবস্থা ছিল। এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার ও যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি বার্তা পাঠান। বিভিন্ন ক্রীড়া ও যোগ সংস্থা, স্কুল শিক্ষার্থী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করে।

বর্ষপঞ্জির হিসেবমত আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল হলেও পৃথিবীর প্রতিবেশগত ভারসাম্য লঙ্ঘিত হওয়ায় আষাঢ় মাসের শেষতক আজও বর্ষার দেখা নেই। আর যদিও থাকে মেঘ-বজ্রের ঘনঘটা, তবু বজ্রপাতের এমনই সমারোহ যে মৃত্যুর শংকা মাথায় নিয়ে বর্ষা উদ্‌যাপন বুঝি বাঙালিকে বাদ দিতে হয়! কাজেই রবিঠাকুর বর্ষা নিয়ে যতই গান বাঁধুন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়' বুঝি আর প্রেমিকমনে আলোড়ন তুলবে না। আমরা জানি, মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ধারণা করা হয়, এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লাখ বছর আগে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। তাই এ অঞ্চলে সে সময় ভারি বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহে এই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্টে ভর্তির সুযোগ

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, ভারতের বিশাখাপত্তনম, হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ভারতের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট (জিআইটিএএম) বাংলাদেশের যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৌশল, বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, ফার্মেসি, স্থাপত্যবিদ্যা, আইন, মেডিসিন, নার্সিং, সমাজ বিজ্ঞান এবং গান্ধীয়ান স্টাডিজের মত বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল এবং অন্যান্য পর্যায়ে ১৯০টি প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ দিচ্ছে। চার হাজার একরের বেশি জমিতে অবস্থিত জিআইটিএএম-এর এই তিন বিশ্বমানের ক্যাম্পাসে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবং প্রায় এক হাজার চারশ শিক্ষক রয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (এনএএসি) জিআইটিএএম +গ্রেড-এর স্বীকৃতি দিয়েছে।

জিআইটিএএম-এ উপরোক্ত কোর্সসমূহে অংশ নিতে আগ্রহী প্রার্থীরা অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
শ্রী কে পি সি কিষাণ
পরিচালক (এফএসএ)
জিআইটিএএম, বিশাখাপত্তনম
+৯১ ৭৬৬০০ ০০৬৫৮, ০৮৯১-২৮৬৬৪৭৭

কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০% বৃত্তি

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, ভারতের ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অবস্থিত ইউজিসি অনুমোদিত বেসরকারি কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দশজন শীর্ষ শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি-এর উপর শতভাগ বৃত্তি প্রদান করবে। আফগানিস্তান, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া ও উগান্ডা থেকে প্রায় ৩০০জন বিদেশী শিক্ষার্থী কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে।

জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে ৩০তম স্থানে থাকা কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফার্মেসি, এম-ফিল ও পিএইচডি ব্যতীত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এসব বৃত্তি দেওয়া হবে।

স্নাতক পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা– উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৫% (জিপিএ-৫)। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন থেকে সমমানের সনদ আবশ্যক।

টিউশন ফি ব্যতীত বাৎসরিক খরচ হোস্টেল ফিসহ আনুমানিক ৭০,০০০ রুপি।

শ্রীমতী মীনাক্ষী সিং
ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং, কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি নং ২এ, রোড নং- ৮, বারিধারা কূটনৈতিক জোন, ঢাকা- ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: +৯১৭৪৭০৭৮৪০০০
ই-মেইল: minakshisingh.ku@gmail.com
ওয়েব: www.kalingainiversity.ac.in
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময় ছিল ৩০ জুন ২০১৮।

ভারতে ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির সুযোগ

আইআইসিসিআই বাংলাদেশ লিমিটেড বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতের ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট কোর্স ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা, বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভারতীয় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট কোর্সগুলোতে আবেদন আহ্বান করছে। মহারাষ্ট্রের পুনেতে অবস্থিত ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ইনস্টিটিউটে যোগাযোগ করুন:
http://ftiindia.com/Admission_2018_For.html
একাডেমিক অফিস: academicsftii@gmail.com
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময় ছিল ৩০ জুন ২০১৮।

ইন্ডিয়া এডুকেটস শিক্ষামেলা ২০১৮

ঢাকায় ফ্লেমিংকো কনভেনশন সেন্টারে 'ইন্ডিয়া এডুকেটস শিক্ষামেলা ২০১৮' (২৯-৩০ জুন, ২০১৮) উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা। যেসব ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে সেগুলো হল:

১. কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি (কেআইআইটি, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা);
২. মানভ রচনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (দিল্লি এনসিআর);
৩. ভেল টেক (চেন্নাই, তামিলনাড়ু);
৪. জৈন ইউনিভার্সিটি (বেঙ্গালুরু, কর্নাটক);
৫. ইনটিগ্রাল ইউনিভার্সিটি (লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ);
৬. দ্য নিওশিয়া ইউনিভার্সিটি (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ);
৭. ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেঘালয় (বারিদুয়া, মেঘালয়);
৮. কাজিরাঙা ইউনিভার্সিটি (জোড়হাট, আসাম);
৯. স্যাফায়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (রাঁচি, ঝাড়খণ্ড);
১০. মীনাক্ষী ওয়ার্ল্ড স্কুল (দিল্লি এনসিআর)
১১. মীনাক্ষি পাবলিক স্কুল (দিল্লি এনসিআর)।

● বিজ্ঞপ্তি

ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত

২১ জুন ২০১৮ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা-৮টায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রায় ১০,০০০ মানুষের অংশগ্রহণে প্রাচীন ভারতীয় যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে আইজিসিসি ও ঢাকার বিভিন্ন যোগ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যোগাসন প্রদর্শন, গণ যোগ সেশন এবং একটি লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় হাই কমিশনের এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার ও যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় উপস্থিত ছিলেন। হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি বার্তা পাঠান। বিভিন্ন ক্রীড়া ও যোগ সংস্থা, স্কুল শিক্ষার্থী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করে। সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং মিডিয়া জগতের অনেক তারকাও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) ভারতীয় সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষক শ্রীমতী মাম্পি দে সাধারণ যোগ নিয়মাবলী পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে একটি লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীরা পুরস্কার হিসেবে একটি টাটা টিয়াগো গাড়ি, একটি বাজাজ মোটরসাইকেল, ভারতে ভ্রমণ প্যাকেজ, দু'জনের দিল্লি ট্রিপ এবং ঢাকায় পাঁচ তারা হোটেলে দু'জনের থাকার সুযোগ লাভ করেন। প্রথম পুরস্কার টাটা টিয়াগো গাড়ি বিজয়ী হন মো. খায়রুল হাসান খান। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগেও একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন যোগ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনে ভারতের প্রস্তাবটি ১৭৫টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে। জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবের প্রতি এটিই ছিল সর্বোচ্চসংখ্যক রাষ্ট্রের সমর্থন প্রদানের রেকর্ড।

যোগ দিবস পালনের আন্তর্জাতিক ঘোষণার পর থেকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই

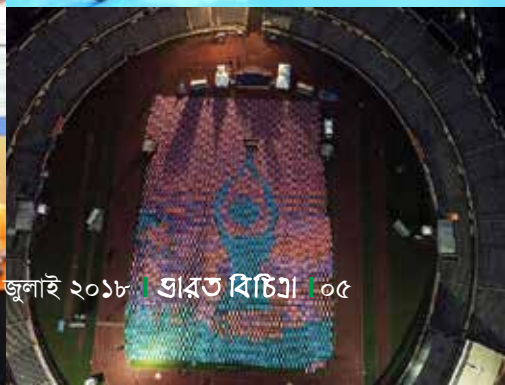

কমিশন বাংলাদেশে বড় আকারে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। ২০১৭ সালে ঢাকায় একই স্টেডিয়ামে পাঁচ হাজার যোগাভ্যাসকারীর সমাগম হয়।

এর আগে ১২ জুন ২০১৮ ভারতীয় হাই কমিশনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৮ এর পর্দা উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অনেক তারকা যোগ দেন। পরদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ডেপুটি হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনের অংশ হিসেবে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনে সাপ্তাহিক যোগ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যোগ শিক্ষিকা শ্রীমতী মাম্পি দে সেশনটি পরিচালনা করেন।

ভারতীয় হাই কমিশনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের পর্দা উন্মোচন

এর আগে মে মাসে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে পর্দা উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, মঞ্চ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এবারের অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকল অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনামূল্যে যোগ ম্যাট, টি-শার্ট, উপহারসামগ্রী এবং লাকি ড্র-এর মাধ্যমে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। পুরস্কারের মধ্যে একটি টাটা টিয়াগো কার, একটি বাজাজ মোটর সাইকেল, ভারতে ভ্রমণ প্যাকেজ, দু'জনের দিল্লি ট্রিপ, ঢাকায় পাঁচ হোটেলে দু'জনের থাকার সুযোগসহ নানা আকর্ষণীয় উপহার।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

২৬ জুন ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আসামের করিমগঞ্জের সাংসদ শ্রী রাধেশ্যাম বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গীপুরের সাংসদ শ্রী অভিজিৎ মুখার্জি এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাংসদ শ্রী বিষ্ণুপদ রায়কে বাংলাদেশে স্বাগত জানান

১৮ জুন ২০১৮
ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের মাধ্যমে ভিসা পরিষেবা অব্যাহত রাখতে ভারতীয় হাই কমিশন এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

২২ জুন ২০১৮
ভারতীয় হাই কমিশনে ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের (আইভিএসি) ৭৫জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। হাই কমিশনার আইভিএসি কর্মীদের ভিসার পরিষেবা এবং গ্রাহক সেবায় গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কান্ট্রি হেড এবং কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন

ভারতীয় হাই কমিশনে ইফতার আয়োজন

৬ জুন ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতীয় হাই কমিশনের চ্যান্সেরি কমপ্লেক্সে এক ইফতার ও সান্ধ্যভোজে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বিশিষ্টজনদের আপ্যায়িত করেন। এ আয়োজনে জাতীয় সংসদের স্পিকার, মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টা, বিরোধীদলীয় নেতা, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী নেতা, গণমাধ্যম কর্মী ও সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন

নৌবাহিনি প্রধান অ্যাডমিরাল সুনীল লানবার ঢাকা সফর

২৪ জুন ২০১৮ ভারতীয় নেভাল স্টাফ প্রধান এডমিরাল সুনীল লানবা এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকা এসে পৌঁছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনির নেভাল স্টাফ প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদের আমন্ত্রণে তাঁর এ সফর। শ্রী সুনীল লানবা ভারতীয় স্টাফ কমিটির প্রধানদের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতীয় নৌবাহিনি প্রধানের সফর সঙ্গীদের তালিকায় তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রীনা লানবা ও তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ঢাকায় কর্মব্যস্ততার মধ্যে শ্রী অনিল লানবা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশে ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তিনি ঢাকার মীরপুর এলাকায় জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজের শিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন নৌ স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

এডমিরাল লানবার সফরে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও জোরদার হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকমহলের ধারণা।

এ সফরকালে দুই নৌপ্রধান যৌথভাবে চট্টগ্রামে সমন্বিত টহল (কর্ডিনেটেড প্যাট্রল–করপ্যাট)-এর উদ্বোধন করেন। দুই দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত নৌবাহিনির মধ্যে করপ্যাট পরিচালিত হল।

ভারতীয় নৌবাহিনি প্রধান এর আগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসেন। সেবার ভারত মহাসাগর নেভাল সিম্পোজিয়ামের অধীনে বাংলাদেশ নৌবাহিনি আয়োজিত আইওএনএস ম্যাল্টিল্যাটেরাল মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ এক্সারসাইজ (আইএমএমএসএআরইএক্স) অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি ঢাকা এসেছিলেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

০৫ জুন ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ঢাকায় বারিধারা কূটনৈতিক এনক্লেভ ক্লাবে ভারতীয় আমদানিকারক চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইআইসিসিআই) আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের আওতায় সরকার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা চার বছরের জন্য বছরে ২৪ হাজার টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা দুই বছরের জন্য বছরে ১০ হাজার টাকা করে বৃত্তি পেয়ে আসছেন। এই স্কিমে এই পর্যন্ত ১০ হাজার ৯৩৬ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন; তাদের জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৭ সালে এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর উপলক্ষে নতুন ঘোষিত স্কলারশিপ স্কিমে আগামী ৫ বছরে মোট ১০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এবং এ জন্য ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ১,০০০ এবং স্নাতক পর্যায়ে ১,০০০–মোট ২,০০০ শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। চলমান পুরনো স্কলারশিপ স্কিমের পাশাপাশি এই স্কিম চলবে।

এ বছর পুরনো স্কলারশিপের আওতায় ৪০০ স্নাতক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। নতুন স্কিমে মোট সংখ্যা ১,৬২১ জন শিক্ষার্থী–এর মধ্যে ১,০০০ স্নাতক পর্যায়ের এবং ৬২১ জন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ঢাকা বিভাগের ৩৭৬জন শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি বৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর, ময়মনসিংহের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করা হবে।

আইটেক কর্মসূচি

তরুণ পেশাজীবীদের জন্য বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কৌশল কাঠামোর আওতায় ভারতের উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আইটেক কর্মসূচি প্রচলিত হয় যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং যথাযথ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর হিসাব, নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এসএমই, গ্রামীণ উন্নয়ন, সংসদীয় বিষয়াবলীর মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ১৬১টি সহযোগী দেশে ১০,০০০-এর বেশি প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে আইটেক কর্মসূচির অধীনে ৩,৫০০-এর বেশি বাংলাদেশী তরুণ পেশাজীবী ভারতে এ ধরনের বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করেছে।

ভারত সরকার ১৯৭২ সাল থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া স্নাতক থেকে পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে সকল বিষয়ে আইসিসিআর বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ভারতে অধ্যয়নের জন্য ৩,২০০-এর বেশি মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা সবাই বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

● বিজ্ঞপ্তি

বহু সংস্কৃতির ধারা বয়ে যায় ভারতে এমনটাই মনে করতেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তিব্বত থেকে প্রচুর লুপ্ত বৌদ্ধ পুঁথি এনেছিলেন। সাম্য, মৈত্রীর টানে গিয়েছেন সোভিয়েত। জাতীয়তাবাদের ছক ভেঙে নিজেকে বারবার নতুন করে গড়েছেন তিনি।

নিবন্ধ//১

বহু সংস্কৃতির ধারা বয়ে যায় ভারতে

জেতা সাংকৃত্যায়ন

রাহুল সাংকৃত্যায়নের অসাধারণ জীবন আসলে ভারতের নবজাগরণ থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের জন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত এক যাত্রার ভাষ্য। জীবনকথা তো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হয়ে থেকে যায়। রাহুল নিজেই বলে গিয়েছেন যে তাঁর নিজের জীবনের যাত্রা অনেক সহজ হত, যদি তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করতেন। জীবনকথা কী করে লিখতে হয় সেই কৌশল তাঁর অনায়ত্ত, রাহুল লিখেছেন তাঁর *মেরি জীবন যাত্রা* গ্রন্থে। এই বইয়ে লেখা আছে এমন এক ভারতবর্ষের কথা, যে ভারতের অস্তিত্ব এককালে ছিল, কিন্তু এখন অদৃশ্য। রাহুলের লেখা থেকেই সেই ভারতকে পুনরাবিষ্কার করা সম্ভব।

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার পাণ্ডাহা গ্রামে ১৮৯৩ সালে তাঁর জন্ম। আসল নাম কেদারনাথ পাণ্ডে। শিশু কেদারকে নিয়ে তাঁর মাতামহের খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র বলে কথা! তিনি ছিলেন একজন পুরবিয়া সৈন্য, সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করতেন।

অদূর ভবিষ্যতেই ভারত বহুবিধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে চলেছে, বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। নাতিকে নিজামাবাদের উর্দু মাদ্রাসায় পড়ানোর বন্দোবস্ত করলেন এমন এক সময়ে, যখন মাদ্রাসাগুলোই ছিল গ্রামাঞ্চলে শিক্ষালাভের একমাত্র স্থান। রাহুলের সমসাময়িক আরও অনেকেই (যেমন মুনশি প্রেমচন্দ) পড়েছেন এই উর্দু স্কুলগুলিতেই। তাঁর 'মুণ্ডন'-এর সময় সারনাথের ধামেক ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে ট্রেনে চড়ে যাওয়ার স্মৃতি লিখে গিয়েছেন রাহুল। লিখে গিয়েছেন লোরিক নামের আহির-এর কথা, দুই বিশাল ঘড়া ভর্তি দুধ নিয়ে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে ধামেকের সিঁড়ি বেয়ে নামছিল সে। মজার কথা এই, সে দিনের শিশু কেদার তিন দশক পরে ফিরে এসেছিলেন একই জায়গায়, বৌদ্ধ পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিসেবে। মহাবোধি সোসাইটির মূলগন্ধকুটি বিহারের উদ্বোধনে ধর্মপালকে সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি সেবার। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে জানা গেছে, এই জায়গাতেই ছিল অশোকের ধামেক স্তূপ। তিরিশ বছর ধরে, একটু একটু করে গ্রাম্য কিশোর কেদার হয়ে উঠেছিল রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামের এক পরিণত চিন্তক। যিনি একই সঙ্গে কর্মী ও পণ্ডিত। তাঁর পরিবারে এই সারস্বত সাধনার সমর্থন সেভাবে ছিল না। নিজের পারিবারিক 'সংকৃতি' গোত্র সম্পর্কে রাহুল একবার মজা করে বলেছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার অভ্যেস শেষ হয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগেই, যখন ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করে তাঁরা নিজেদের কতকগুলো গ্রাম্য ও অসংস্কৃত নাম দিয়েছিলেন। সরকারি বৃত্তির অভাবে রাহুলের প্রথাগত শিক্ষা শেষ হল উর্দু মিডল স্কুলেই। অন্য আরও অনেক পুরবিয়ার মতই কেদার বাড়ি ছাড়লেন, তখন তাঁর তেরো বছর বয়স। এলেন কলকাতা শহরে। কলকাতার রাস্তায় তিনি তখন জীবন, জ্ঞান আর অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য নানান কাজ করেছেন, হয়েছেন ফেরিওয়ালা, রেলের হেল্পার, কখনও-বা কারও রাঁধুনিও। কলকাতার পথের অভিজ্ঞতা তাঁকে একেবারে পালটে দিল। এই শহরই তাঁকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলল, সজাগ করল রোজকার বেঁচে থাকার লড়াই নিয়েও। রাস্তার সাইনবোর্ড, পোস্টার দেখে দেখে তিনি ইংরেজি পড়তে শিখলেন। আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝলেন, তাঁর না-দেখা নতুন যে জগৎ পড়ে আছে, তাকে তিনি জয় করতে পারবেন শুধু নিজের পড়াশোনা, শিক্ষার যোগ্যতা দিয়েই।

পড়াশোনার সুযোগ পেলেন বারাণসীতে, আর বিহারের ছাপরার কাছে পারসা মঠে। এই মঠে তাঁর অন্তর্ভুক্তি হল 'উদাসী' সাধু রামোদর হিসেবে। ছিন্ন হল পরিবার, বাড়ির বাঁধন। পরে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি নিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে দক্ষিণ ভারতের তিরুমিশি-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সে যাত্রার অনেকটা অংশই স্রেফ পায়ে হেঁটে। মহাকাব্যিক এই যাত্রায় রাহুল বুঝতে পারলেন, ভারত হল নিরবশেষ এক ভূখণ্ডের নাম, যেখানে প্রতি চার ক্রোশ অন্তর মানুষের মুখের ভাষা পালটে যায়। আবার উত্তর ভারতে অযোধ্যায় তিনি আকৃষ্ট হলেন আর্যসমাজের প্রতি। লাহৌর আর আগ্রার 'আর্য মুসাফির বিদ্যালয়'-এর বৌদ্ধিক ছত্রছায়ায় তিনি যেন

অভিযাত্রী: দিল্লিতে হিন্দি ভাষার লেখকদের সঙ্গে বৈঠকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)

রাহুল চারবার তিব্বত গিয়েছিলেন। দুঃসাহসিক এই চারটি যাত্রায় তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকগুলি হারিয়ে যাওয়া পাতা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে ভ্রমণের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় 'অ্যাক্টিভিজ্‌ম' দরকার।

পুনরাবিষ্কার করলেন ভারতের বৈদিক অতীতকে। ফিরলেন বৈষ্ণব দর্শনের পথ থেকে। এই সময়েই সংস্কৃত ন্যায় ও মীমাংসার পাঠের মাধ্যমে প্রবেশ করলেন ভারতীয় দর্শনের গভীরে। তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে। যে বিহারে একদিন তিনি সন্ন্যাসী রূপে কাজ করেছেন, সেই বিহারেই রাহুল কাজ শুরু করলেন কংগ্রেসের কর্মী-প্রচারক হিসেবে। রাজনৈতিক সংযোগ ও কার্যকলাপের জেরে অচিরেই কারাবন্দী হলেন। বন্দিদশায় পড়লেন বৌদ্ধযুগের ভারতে ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত, বর্মি লিপিতে লেখা পালি গ্রন্থ 'মজ্ঝিমনিকায়'। পরবর্তীকালে ভারতে বৌদ্ধ পুনরুভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে প্রধান কাজ ছিল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি খুঁজে বের করা। এই গ্রন্থগুলি হারিয়ে গিয়েছিল, ভারতে এগুলির কোনও খোঁজই ছিল না। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত রাহুল জানতেন, ভারতের লিখিত ইতিহাসে ১৫০০ বছরের একটি ছেদ আছে, যখন বিহার ও বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল কাবুলে, দক্ষিণ ভারতে। রাহুল চারবার তিব্বত গিয়েছিলেন, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই। দুঃসাহসিক এই চারটি যাত্রায় তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকগুলি হারিয়ে যাওয়া পাতা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে ভ্রমণের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় 'অ্যাক্টিভিজ্‌ম' দরকার। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখা তাঁর প্রচারপত্রটি তিনি লিখেছিলেন লাসা-য় বসে। ১৯৩৮ সালে তাঁর শেষ তিব্বত অভিযান থেকে ফেরার পর বিহারে কৃষকদের হয়ে কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তিনি। 'অল ইন্ডিয়া কিসান সভা'-র সভাপতি নির্বাচিত হলেন, ১৯৩৯ সালে ফের কারাবন্দি হলেন। ১৯৪৩-এ হাজারিবাগ কারাগারে বসেই কথা সাহিত্যের আদলে লিখেছিলেন *ভলগা সে গঙ্গা*। এই বই লেখার সময় কাজে লাগিয়েছিলেন সেই একই ঐতিহাসিক তথ্য আর নোট, মানবসভ্যতার বিবর্তন নিয়ে লেখা তাঁর ধ্রুপদী মার্কসীয় গ্রন্থ *মানব সমাজ* লেখার ক্ষেত্রেও যা ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩০ ও '৪০-এর দশকে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার, এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে চিন বিপ্লবের পর চিনের সঙ্গে সংযোগ তাঁকে কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে পরিবর্তন সাধনের ভাবনায় প্রাণিত করেছিল। সাংস্কৃতিক ভারতের আরম্ভ ও তুঙ্গস্পর্শ কোনওটাই যে আধুনিক ভারতের নিজস্ব সম্পদ নয়, বরং বহির্ভারতের সভ্যতাগুলিতেও তার বিকাশ হয়েছিল, রাহুলের লেখা এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। তিনি ব্যবহার করেন এক নদীর রূপক, অসংখ্য শাখানদীকে যে নদী নিজেতে মিশিয়ে নিয়ে বয়ে চলে। রাহুল বলেন, মিশ্র সংস্কৃতিগুলি এভাবেই একে অন্যের মধ্যে জড়িয়ে থাকে, স্থানে স্থানে তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভাবনার ভারতবর্ষ পারস্পরিক সমতা ও সমানাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক রাষ্ট্র। এমন এক দেশ, যেখানে 'প্রিভিলেজ' শব্দটাই অপ্রয়োজনীয়, কারণ সমস্ত প্রতিভা, সকল দক্ষতা এই ভূমিতে নিজেদের মেলে ধরবার সমান ও পর্যাপ্ত জায়গা পায়। এক বিশ্বাস থেকে আর এক বিশ্বাসে চলতে চলতেও, রাহুল সবসময় যেমন বুদ্ধের, তেমনই বুদ্ধির, মননেরও প্রকৃত অনুগামী। *মেরি জীবন যাত্রা* বইয়ের ভূমিকায় বুদ্ধকে তাঁর শিক্ষক ও গুরু আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'নানান অভিমতকে আমি গ্রহণ করেছি একটা নৌকোর মত, যাতে নদী পেরিয়ে বিপরীত তীরে যেতে পারি। কিন্তু সেই অভিমতগুলোকে এমন বোঝা করে তুলিনি, যাতে মনটাই পাষাণভার হয়ে যায়।

জেতা সাংকৃত্যায়ন
ভারতীয় বুদ্ধিজীবী

ছবি: কুনাল বর্মণ

নিবন্ধ//২

আমার কলেজের ছেলেদের মারবি?

শুভাশিস চক্রবর্তী

দুই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ থামাতে রীতিমত পুলিশ ডাকতে হত। রক্তগঙ্গা বইত কোনও কোনও দিন, এতই তীব্র ছিল দু'টি কলেজের ছাত্রদের রেষারেষি। আজ থেকে কম-বেশি দেড়শো বছর আগে। যুযুধান দুই পক্ষের একটি সংস্কৃত কলেজ, অন্যটি হিন্দু কলেজ। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইট-পাটকেল জোগাড় করে রাখত তেতলার ছাদে। মারামারি শুরু হলে উপর থেকে ছুড়ে মারত। আঁকে পড়ত শান্ত, গোবেচারা ছেলেরা।

দু'পক্ষের সংঘর্ষ যতক্ষণ চলত, তারা লুকিয়ে থাকত কলেজের কোনও ক্লাসঘরে। পুলিশ এলে লড়াই থামত, তারা সাহস পেত বাড়ি যেতে। 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকার ১৮৬২-র ৩০ আগস্ট সংখ্যায় লেখা 'হিন্দু কালেজ ও সংস্কৃত কালেজের কতিপয় ছাত্র বিরোধী হইয়া পথিমধ্যে পরস্পর দাঙ্গা করিয়াছে।'

এই সংবাদেই জানা গেছে সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা হেরে গেছে; হারের কারণ নাকি 'হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা তেজস্বী বিশেষতঃ ধনী ভাগ্যধর লোকের সন্তান।'

হিন্দু কলেজের ছাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, দুই কলেজের মধ্যে প্রায়ই যে সংঘর্ষ হত তার জোরালো কোনও কারণ থাকত না, 'বালকসুলভ চাপল্যমাত্র। তখনকার দিনে এ এক প্রকার ফ্যাশানের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। কখনও কখনও এই দুই দলের লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথাফাটাফাটি পর্যন্ত হইত।'

আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু স্কুলের ইংরেজ হেডমাস্টারের কাছে এই নিয়ে নালিশ করতে যেত কেউ-কেউ, কিন্তু তিনি খুব একটা গ্রাহ্য করতেন না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মশাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতেন কোন পক্ষ জেতে, কোন পক্ষ হারে। দাঙ্গাবাজ ছাত্রদের পুলিশ একবার থানায় নিয়ে গেলে বিদ্যাসাগরই ছুটেছিলেন তাদের ছাড়িয়ে আনতে। তবে ছাত্রদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না কখনও। একবার তরুণ অধ্যাপক কালীচরণ ঘোষকে অপদস্থ করার অপরাধে একটা ক্লাসের সব ছাত্রকে তাড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। ছাত্ররাও কম যায় না। তারা দল বেঁধে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিল, সঙ্গে ধর্মঘটের হুমকি। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকে শো-কজ নোটিশ পাঠালে বিতাড়িত ছাত্রদের মহাফুর্তি– এবার বিদ্যাসাগরের চাকরি যাবেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর জানিয়ে দিলেন, এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর যুক্তি মেনে বহিষ্কৃত ছাত্রদের জানিয়ে দিলেন, এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর যা করবেন, তা-ই হবে।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, সংস্কৃত কলেজের ভিতরেও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট মারদাঙ্গা হত। একবার সামান্য একটা ছোঁট কাঠের মই নিয়ে দুটো ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে ভয়ানক মারামারি হয়েছিল যাতে শিবনাথ নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। দাঙ্গার জেরে ছুটির পর কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব ছাত্রদের আটকে রেখে নিজে তদন্ত করেছিলেন। সে-যাত্রায় প্রত্যেক ছাত্রকে দু'টাকা করে জরিমানা গুনতে হয়েছিল।

হিন্দু কলেজের ভিতরেও ছাত্ররা মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ত প্রায়ই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন তাঁর স্মৃতিচারণায় আছে এমন এক ঘটনা। হিন্দু স্কুল তখন শ্যাম মল্লিকদের জোড়াসাঁকোর থামওয়ালা বাড়িতে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে। একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখলেন, স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই একটা লোককে পুলিশের এক কনস্টেবল থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর তাঁর বন্ধুরা পুলিশটিকে অনুরোধ করলেন তাকে ছেড়ে দিতে। কনস্টেবল সে কথা কানেই তুলছে না দেখে ইটের ঢিবি থেকে ইট তুলে ছুড়ে মারতে শুরু করলেন পুলিশটিকে তাক করে। প্রাণ বাঁচানোর দায়ে কনস্টেবল লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সটক্লিফ। তিনি ছুটি নিলে অধ্যাপক ফ্লিন্ট অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতেন। এই ফ্লিন্টের উপরে ছাত্ররা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ কলেজের কিছু ছাত্র ফ্লিন্টের মাথার টুপি দিয়ে তাঁরই মুখ ঢেকে দিয়ে বেদম প্রহার করেছিল। টুপিতে মুখ ঢাকা ছিল বলে প্রহারকারী ছাত্রদের চিনতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর তখন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের দু'দল ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে। একদল আরেক দলের পিছনে ভাড়া-করা গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে। কলেজের একদল ছাত্র সে দিন বাড়ি যেতে পারছে না, গুণ্ডার ভয়ে কলেজেই বসে আছে।

সেদিন বিদ্যাসাগর অসুস্থ ছিলেন বলে কলেজে আসেননি। তবু তাঁর কানে এই সংবাদ পৌঁছে গেল। অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠলেন পালকিতে। কলেজে পৌঁছে প্রথম যে গুণ্ডাকে সামনে পেলেন, তাকে ডাকলেন। পায়ের চটি হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর তাকে বললেন, 'আমার কলেজের ছেলেদের তোরা মারবি? এত সাহস!' গুণ্ডাটা উত্তর না দিয়ে বিদ্যাসাগরকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। দেখাদেখি অন্য গুণ্ডারাও তার পিছু নিল।

আরেকটি ঘটনা এই মেট্রোপলিটনেরই। সেখানকার ছাত্র জয়কৃষ্ণ সেনের নামে একটা অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজনাথ দে। মন্তব্যটি শুনে জয়কৃষ্ণ রেগে অগ্নিশর্মা। দারোয়ানের ঘর থেকে এক খণ্ড জ্বলন্ত পোড়াকাঠ নিয়ে ব্রজনাথকে তাড়া করে গেল, বলতে লাগল, 'আজ ষাঁড়দাগা করে ছাড়ব।' ব্রজনাথ সেই যাত্রায় দৌড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

বনমালী চলে গেলে ওই পরিচারক প্রতিশোধ নিতে নামল। একটা কুইনাইনের পাত্র হাতে নিয়ে সোজা চলে গেল প্রিন্সিপাল লেক সাহেবের কাছে। বনমালী নাকি কুইনাইন চুরির জন্য এই পাত্র সরিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

১৮৬২ সালের শেষদিকে মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাসের দেড়শোজন ছাত্র একটি ঘটনায় একসঙ্গে কলেজ ত্যাগ করেছিল। প্রতিদিন সকালবেলায় তখন বাংলা ক্লাসের ডাক্তারি পড়ুয়াদের হাতে-কলমে ওষুধ ও পথ্যদানের পদ্ধতি শেখানো হত। এর জন্য ছাত্রদের চিকিৎসালয়ে হাজির থাকতে হত। বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে একছাত্র কাজটি করছিলেন, তখনই সেখানে এক পরিচারকের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। বনমালী চলে গেলে ওই পরিচারক প্রতিশোধ নিতে নামল। একটা কুইনাইনের পাত্র হাতে নিয়ে সোজা চলে গেল প্রিন্সিপাল লেক সাহেবের কাছে। বনমালী নাকি কুইনাইন চুরির জন্য এই পাত্র সরিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। বাংলা ক্লাসের ছেলেগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না প্রিন্সিপাল। কার্য-কারণ অনুসন্ধান না করে, বাংলা ক্লাসের ছেলেগুলোকে চোর, বদমাশ ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে সোজা পুলিশে জানালেন। পুলিশ অধ্যক্ষ ও পরিচারকের কথা শুনে বনমালীকে কুইনাইন চুরির অপরাধে দশদিনের কারাদণ্ড দিয়ে দিল। সংবাদটি বিস্তারিতভাবে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

উত্তাল হয়ে গেল মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাস। বিনা দোষে সহপাঠীর কারাবাস, প্রিন্সিপালের অশ্রাব্য গালিগালাজের প্রতিবাদে দেড়শো ছাত্র কলেজ ত্যাগের চিঠি জমা দিল। নেতৃত্বে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। প্রিন্সিপাল ছাত্রদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে, সেই সঙ্গে মন্তব্য লিখে দিলেন, 'ছাত্রেরা একজন চোরের সহিত সমদুঃখতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে, অতএব তাহাদিগের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।'

বিজয়কৃষ্ণ সদলবলে বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন। পুরো ঘটনার বিবরণ শুনে উত্তেজিত বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে সব জানালেন। তাঁরই হস্তক্ষেপে কর্তৃপক্ষ প্রিন্সিপালকে দোষী সাব্যস্ত করে ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করল।

মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারি শ্রেণিতেও ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৫০ সালের জুন মাসে। বেশ কিছু ছাত্র তাদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে কাজকর্ম, ক্লাস সব বন্ধ করে দিলে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নামেন এবং সাত জন ছাত্রকে 'দুষ্কৃতি' আখ্যা দিয়ে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেন। ১৮৫২ সালে শিক্ষাবর্ষের শেষে মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়া কয়েকজন ছাত্র কলেজ চত্বরের বাইরের কিছু লোকের সঙ্গে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং দশজন ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে বিচারের জন্য পেশ করা হয়। শাস্তি হিসেবে তাদের জরিমানা হলেও কলেজের সচিব এই গুরুতর বিষয়টির উপর তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠান শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে। কাউন্সিল এই দশজন ছাত্রকে (৬ জন বৃত্তিধারী এবং ৪ জন বিনা বেতনের) দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে।

কলেজে পড়ার সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে অনেকবার মারদাঙ্গা করেছেন রাধানাথ সিকদার, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে। গোমাংস-প্রিয় রাধানাথ নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। বক্সিংও লড়তেন ভাল। অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারতেন না। প্রতিবাদ করলে অবধারিত দাঙ্গা শুরু হত। একদিকে একদল সাদা চামড়া, উলটো দিকে তিনি একা।

জিততেন অবশ্য রাধানাথই।

শুভাশিস চক্রবর্তী ভারতের সাংবাদিক

সারস্বত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে স্নাতক প্রথম মুসলমান ছাত্র। পরে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পৃষ্ঠপোষক

নিবন্ধ//৩

বেদে সর্বোচ্চ নম্বর, তবু ক্লাসের বাইরে...

সুনন্দনকুমার সেন

তখন তিনি বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেন। স্বেচ্ছায় নয়, নিতান্তই পেটের দায়ে। শিক্ষকতা ও গবেষণা করা যাঁর সুপ্ত বাসনা, তাঁর কি 'ব্যাড লাইভলিহুড' ভাল লাগে? বিএল ডিগ্রিটার এই রকম নামই দিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। আশুতোষ তাঁকে বললেন, 'বার ইজ নট ইওর প্লেস শহীদুল্লাহ্। জয়েন দি ইউনিভার্সিটি।' গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধশতকে যত উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

জহুরি যেমন জহর চিনতে ভুল করে না, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও শহীদুল্লাহ্‌কে চিনতে ভুল করেননি। আশুতোষ জানতেন, লেখাপড়া করার জন্য কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে তাঁর এই ছাত্রটিকে। একে মুসলমান, তার উপরে পড়াশোনার বিষয় সংস্কৃত! তখনকার সমাজে এই সংমিশ্রণ বিরল।

হুগলি কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন শহীদুল্লাহ্।

হরিনাথ দে'র পরামর্শে ইংরেজি ছেড়ে দিয়ে শুধু সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। লেখাপড়ায় ছেদ পড়ল। এক বছর পরে যখন বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিলেন, এক নম্বরের জন্য পাশ করতে পারলেন না। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে কলেজে ভর্তির চেষ্টাও ব্যর্থ হল। মুসলমান ছাত্রকে সংস্কৃতে ভর্তি করতে কলেজগুলি অনিচ্ছুক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভর্তি হলেন কলকাতা সিটি কলেজে। সম্ভবত ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত কলেজ বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। একবছর পর বেদের পত্রে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংস্কৃতে স্নাতক প্রথম মুসলমান ছাত্র তিনি।

ভাগ্যের পরিহাস তাঁর জীবনের চলার পথে সঙ্গী হয়ে থেকেছে। সংস্কৃত নিয়ে এমএ পড়তে এলেন। বেদের ভাষা, দর্শন তাঁর গভীর আগ্রহের বিষয়। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রামী পড়াতেন বেদ। যবন ছাত্রকে বেদ পড়ানো সত্যব্রত সামশ্রামীর পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়, তিনি শহীদুল্লাহ্‌কে ক্লাসে বেদ পড়াতে অস্বীকার করলেন। শোনা যায়, শহীদুল্লাহ্ ক্লাসের বাইরে বেঞ্চে বসে থাকতেন। বেদের ক্লাস না করতে পারলে তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়া আর না পড়া একই ব্যাপার। আশুতোষ জানতেন বেদ নিয়ে শহীদুল্লাহ্‌র গভীর আগ্রহের কথা। সত্যব্রতের মত গোঁড়া ব্রাহ্মণের মত পরিবর্তন কোনওমতেই সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আশুতোষ ছাত্রকে পরামর্শ দিলেন সংস্কৃত ছেড়ে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক শব্দবিদ্যা বিভাগে এমএ পড়তে। কারণ এই বিভাগে বেদ পড়ার সুযোগ আছে। শহীদুল্লাহ্‌র সেই মুহূর্তে সংস্কৃত ছেড়ে অন্য কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল না, তবু আশুতোষের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করলেন। কারণ ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভাষার প্রতি প্রবল আগ্রহ। স্কুল জীবনেই নিজ চেষ্টায় প্রায় আট-ন'টি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে আরবি, ফারসি, উর্দু এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ইংরেজি ও সংস্কৃত। ছাত্রজীবনে হাওড়াতে থাকাকালীন এক উৎকলবাসী রজক পরিবারের সংসর্গে এসে ওড়িয়া ভাষাও শিখে ফেলেন। এ ছাড়াও হিন্দি, নিজ চেষ্টায় কিছুটা গ্রিক ও তামিলও শেখেন। শহীদুল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, যে বয়সে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াত, লাট্টু নিয়ে খেলা করত, সেই বয়সে তিনি ভাষাশিক্ষার জন্য সময় দিতেন।

ভাষা শেখার প্রতি যাঁর এত তীব্র আগ্রহ, তাঁর পক্ষে তুলনামূলক শব্দবিদ্যা নিয়ে এমএ পড়ার সুযোগ কিছু কম নয়। ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, পরিবর্তন, ভাষার সংগঠন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে জানার, শেখার সুযোগ আছে তুলনামূলক শব্দবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনায়। সর্বোপরি আছে বেদ পড়ার সুযোগ। যথাসময়ে এমএ পাশ করলেন। তুলনামূলক শব্দবিদ্যা বিভাগের প্রথম এমএ পাশ করা ছাত্রও শহীদুল্লাহ্। তিনি ওকালতি করুন তা স্যর আশুতোষ চাননি। মামলা-মোকদ্দমার দুনিয়া থেকে লেখাপড়ার জগতে আবার শহীদুল্লাহ্‌কে ফিরিয়ে আনলেন আশুতোষ। তাঁর মধ্যে যে একটা সম্ভাবনা ছিল তা শুধু আশুতোষই প্রত্যক্ষ করেননি, সমকালীন যে যে বাঙালি মনীষীর সংস্পর্শে শহীদুল্লাহ্ এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর বিদ্যাচর্চার গভীরতা এবং অনুরাগ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহ পেয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। শান্তিনিকেতনে একাধিক বার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল। বিশ্বকবি নিজের ছবি ও বই উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। বিশ্বভারতী যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ম্যানেজিং কমিটিতে রবীন্দ্রনাথ তরুণ গবেষক শহীদুল্লাহ্‌কে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। যদিও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট ছিল। বাংলা বানান সংস্কার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শহীদুল্লাহ্‌কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই তিনি বাংলা বানান সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশে উদ্যোগী হন। শহীদুল্লাহ্ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিক বা দার্শনিক নন। তিনি আমাদের দেশের একজন প্রথম শ্রেণির ভাষাবিদও বটে।

শহীদুল্লাহ্ প্রায় দু'বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষক সহকারী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময়েই শহীদুল্লাহ্ বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হন। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তখন দীনেশচন্দ্র সেন উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে দেওয়ার জন্য। তাঁর বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্তি দীনেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে আলাপচারিতায় সবসময় কিছু না কিছু শেখার সুযোগ থাকে।

তাঁর জন্ম এক গোঁড়া মুসলমান পরিবারে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাসে নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইতেন। কিন্তু তাতে কোনও সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। কোরান অধ্যয়নে তাঁর যতটা আগ্রহ ছিল, ঠিক ততটাই উৎসাহ ছিল বেদ বা পালি সাহিত্য অধ্যয়নে।

মাতৃভাষার প্রতি ছিল অবিচল ভক্তি। বাংলার প্রতি কোনও অবিচার তিনি সহ্য করতেন না। পূর্ব পাকিস্তানের উপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। এই নিয়ে কলম ধরতেও দ্বিধা করেননি। মাতৃভাষা আন্দোলনে নিজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলেও ছাত্রসমাজকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আন্দোলনের সময় নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন, 'মাতৃভাষার জন্য যদি তোমার প্রাণ যেত, আমার কোনও দুঃখ থাকত না।' একেই তিনি সংস্কৃতের ছাত্র, তার উপর মাতৃ ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের সরকারের রোষে পড়েছিলেন। তিনি হিন্দু ঘেঁষা, এই তকমাও ছিদ্রান্বেষীরা দিতে দ্বিধা করেনি। দেশভাগের অনেক পরে ভারত সরকার তাঁকে একটি ফেলোশিপ দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু ঘেঁষা শহীদুল্লাহ্‌কে তাঁর দেশের সরকার এই ফেলোশিপ গ্রহণ করার অনুমতি দেয়নি।

সারা জীবন লেখাপড়া, গবেষণা, অধ্যাপনা করে গিয়েছেন শহীদুল্লাহ্। এগুলিই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ছিল অকুণ্ঠ ভালবাসা ও স্নেহ। সর্বদা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কোনও অসুস্থ ছাত্র বা ছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য করা, ঠিক সময় বেতন দিতে না পারার জন্য কোনও ছাত্রের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা থেকে কাটা গেলে তাকে সাহায্য করা– এই সবই করে গিয়েছেন অক্লেশে। কোনও পড়ুয়ার বিবাহের প্রস্তাব হয়তো পরিবার-পরিজন গ্রহণ করছেন না, তাঁদের বুঝিয়েছেন। প্রকৃত ছাত্রদরদি এক শিক্ষক ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র বিদ্যাদান নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করে তুলতে চাইতেন। তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতেন স্বদেশপ্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ।

ভাল খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। মনে করতেন, স্বাস্থ্য ভাল না হলে পড়াশোনা কি গবেষণা-অধ্যাপনা, সবই বৃথা। তাই জীবন ধারণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। মাংস, বিশেষ করে গো-মাংসের প্রতি ছিল তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। ঢাকার যে অঞ্চলে বাড়ি করেছিলেন তার পাশেই ছিল কসাইপাড়া। কখনও যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, এমন জায়গায় বাড়ি করলেন কেন? তার উত্তরে বলতেন, 'স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গোস্ত খাওয়ার প্রয়োজন। পাশেই কসাইপাড়া, হাত বাড়ালেই গোস্ত পাওয়া যায়।' এমনই রসিক মানুষ ছিলেন তিনি।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১৯১০ সালের ১০ অক্টোবর। হালকা চালে বলতেন, 'আমার বিবাহের দিনটা মনে রাখা সহজ। টেন কিউব।' সারা জীবন গুরুগম্ভীর বিদ্যাচর্চা করলেও আসলে মানুষটি ছিলেন সহজ সরল মনের। যে বাংলা ভাষা, যে বাঙালি সংস্কৃতি ছিল তাঁর একান্ত গর্বের জায়গা, জীবদ্দশায় তার বিভাজন তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। কর্মসূত্রে সেই যে ঢাকা গিয়েছিলেন, আমৃত্যু ছিলেন সেখানেই। শেষ জীবনে খুব ইচ্ছে ছিল একবার নিজের মাতৃভূমিতে আসার। কিন্তু সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি। তবু কোনও ভৌগোলিক বিভাজন শহীদুল্লাহকে মাতৃভূমি থেকে আলাদা করতে পারেনি। সাক্ষী তাঁর ঢাকার বাসভবন। নাম রেখেছিলেন, 'পেয়ারা ভবন'। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত পেয়ারা গ্রাম যে তাঁর জন্মভূমি! মাতৃভূমিকে কি কখনও ভোলা যায়! সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি একজন প্রকৃত বাঙালি।

সুনন্দনকুমার সেন
ভারতের শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

জমাট আড্ডায় তিনজন– উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধ//৪

ঠিক যেন যৌথ পরিবারের বড়দা...

‘যদুবংশ’ ছবির শুটিং চলছে। গত শতকের সাতের দশকের গোড়ার দিক। পার্থপ্রতিম চৌধুরী, পরিচালক, হেঁকে উঠেছেন, ‘অল লাইটস’। পজিশন নিতে গিয়ে উত্তমকুমার খেয়াল করলেন, টপ থেকে কোনও একটা লাইট ঠিকমত তাঁর শরীরে এসে পড়েনি। তখন উপরে কাঠের পাটাতনে লাইটম্যানরা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতেন, নির্দেশমত সুইচ অফ-অন করতেন। সেদিন তেমনই একজন, নাম তাঁর কালী, হাটক শোনার পরও ভুলে গেলেন আলো জ্বালতে। শট অবশ্য হয়ে গেল, তবে হয়ে যাওয়ার পর কালীকে ডেকে পাঠালেন উত্তম। শুনে কালী কাঁপতে কাঁপতে উত্তমের মেক-আপ রুমে এলেন। এমনিতে তাঁর কাছ থেকে মাঝেমধ্যেই বিড়ি চেয়ে খান উত্তম, কিন্তু কাজের ভুলের তো কোনও ক্ষমা নেই। কিন্তু উত্তম বকুনি না দিয়ে সস্নেহে তাঁকে বললেন, ‘কী হয়েছে রে কালী? অন্যমনস্ক ছিলিস মনে হল, এনি প্রবলেম?’ হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন কালী, বলেন, ‘মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছে দাদা, কিন্তু আমি কিছুতেই টাকা জোগাড় করে উঠতে পারছি না। তাই... এমনটা আর হবে না। পরের দিন স্টুডিয়োতে বেরনোর আগে উত্তমের বাড়িতে তাঁরই নির্দেশমত কালীকে নিয়ে হাজির পার্থপ্রতিমের সহকারী বিমল দে। তাঁদের দু’জনকে নিয়ে স্টুডিও যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠে উত্তম কালীর হাতে হাজারপাঁচেক টাকার একটা খাম ধরিয়ে বললেন, ‘এটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখ।’

এভাবে হরদম যাঁদের পাশে দাঁড়াতেন, তাঁরা কেউ আত্মীয় ছিলেন না উত্তমের। অথচ উত্তম প্রায়ই তাঁদের অভিভাবক হয়ে উঠতেন, প্রায় একান্নবর্তী পরিবারের স্নেহপরায়ণ দাদার মত। কত মেয়ের যে বিয়ে দিয়েছেন, আজ আর সে কথা কে-ই বা মনে রাখে। মণি শ্রীমানির মত অভিনেতার যাতে অসম্মান না হয়, সে জন্য তাঁর মেয়ের বিয়ের টাকা নিজে না দিয়ে ফাংশন করে তুলে দিয়েছিলেন উত্তম। রাসবিহারী সরকার বিনা ভাড়ায় 'বিশ্বরূপা' হলটি দিয়েছিলেন, গোটা অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছিলেন ভাই তরুণকুমার আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল আকর্ষণই ছিল উত্তমের গানের সঙ্গে অসিতবরণের তবলা। হইহই করে টিকিট বিক্রি হল আর মণি শ্রীমানির মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল।

বিপদে-আপদে সবসময় অন্যের পাশে দাঁড়াতেন, বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দিতেন। কোনও শিল্পী অপমানিত হলে, কলাকুশলীদের কোনও অসুবিধে হলে, বিশেষত নীচের দিকে যাঁরা, তাঁদের হয়ে প্রতিবাদ করতেন। আবার ভবানীপুরের বাড়িতে ধুমধাম করে লক্ষ্মীপুজোও করতেন সকলের সঙ্গে। সেখানেও তিনি বড়দাদা, প্রায় যেন অভিভাবক গোটা বাড়িটার। মায়ার বাঁধন প্রত্যেকের সঙ্গে। পর্দার বাইরে তাঁর এই জীবনটা নিয়ে একটা বই লিখেছেন অশোক বসু, *পর্দার বাইরের মহানায়ক*, তাতে উত্তমের জীবনের এ রকম অজস্র অনুষঙ্গ।

এগুলি ছাপ ফেলত তাঁর অভিনয়েও। অথচ আমরা সে-সব খেয়ালও রাখি না। অভিনয় জীবনের শুরুতে *বসু পরিবার* (১৯৫২), যে ছবি করে উত্তমের প্রসিদ্ধি হল প্রথম, আর একেবারে শেষে *দুই পৃথিবী* (১৯৮০)। এই দু'টি ছবিতেই তিনি পরিবারের বড় ভাই, একান্নবর্তী পরিবারের মাথা। উত্তমের বাবা ছিলেন একা রোজগেরে, সিনেমাহলের প্রজেকশন অপারেটর। ফলে যথেষ্ট স্ট্রাগল দেখেছেন উত্তম, উঠে এসেছেন একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত একটা বড় পরিবার থেকে। নিজের পারিবারিক জীবন আর অভিনয় জীবন যেখানে একাকার, সে সব ছবিতে অভিনেতা হিসেবে অসামান্য তিনি। স্টারডম, লার্জার দ্যান লাইফ বা রোম্যান্টিক ম্যানারিজম-এর খাঁচাটাঁচা সব ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। পরিবার থেকে সমাজ, সর্বত্রই যেন দায়িত্ববান এক অভিভাবক, জাগ্রত বিবেকের মত। *দুই ভাই*, *থানা থেকে আসছি*, *চৌরঙ্গী*, *নিশিপদ্ম*, *এখানে পিঞ্জর*, *যদি জানতেম*, *যদুবংশ*, *অগ্নীশ্বর*, *নগর দর্পণে*... এ রকম আরও কত ছবি।

আড্ডায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মাঝেমধ্যেই উত্তমকুমারকে নিয়ে স্মৃতিতে ফিরে যান... তখন শিল্পী সংসদ আর অভিনেতৃ সংঘের ঝগড়াঝাঁটি বাক্‌যুদ্ধ চলছে, প্রথমটিতে উত্তম আর পরেরটিতে সৌমিত্র। বসুশ্রী সিনেমায় পয়লা বৈশাখ, সৌমিত্র গিয়ে দেখেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে আছেন উত্তম। ওঁরা দু'জন তখন দুই যুযুধান শিবিরে। বাকিটা সৌমিত্রের মুখ থেকেই শোনা যাক, ''আমি গিয়ে ভানুদাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আর যেহেতু দুই শিবিরে আমরা বিভক্ত, তাই উত্তমদাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করে, হাতটা ধরে 'শুভ নববর্ষ' বললাম। বলামাত্র উত্তমদার মুখটা লাল হয়ে গেল। রাগে-দুঃখে। এবং এই হচ্ছে লোকটার মহত্ত্ব। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বড় ভাই, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারিস না!' আমার পরম সৌভাগ্য যে, এই মুহূর্তে আমি যে অন্যায় করেছি, সেই চেতনাটা হল।" সে দিন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যখন উত্তমকে প্রণাম করলেন সৌমিত্র, তখন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন উত্তম।

এই কথাগুলো হয়তো আজ অনেকেরই জানা, তবে মুশকিল হল এটা থেকে আমরা কখনও উত্তমের অভিনয় জীবনের বিচার করতে শিখিনি, যেটা ভারী চমৎকার শিখিয়েছেন সৌমিত্র। বলছেন, 'একটা বিশেষ ধরনের চরিত্রে আমি ওঁর কোনও জুড়ি পাই না। সেটা হচ্ছে একান্নবর্তী পরিবারের বড় ভাই। যেটা ওঁর নিজের মধ্যেও ছিল এবং সে রকম একটা পরিবার থেকেই উঠে এসেছিলেন। অসাধারণ অভিনয়, এই জিনিসগুলো বোধহয় ওঁর মত ভাল আর কেউ করতে পারে না।'

● নিজস্ব প্রদায়ক

চিরসবুজ উত্তম-সুচিত্রা জুটি...

প্রবন্ধ

বহুমাত্রিক মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ

রেফুল করিম

গ্রামবার্ত্তা পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক বাউল গানের প্রচারক এবং *বিজয়বসন্ত* ও *ব্রহ্মাণ্ডবেদ* নামে ধর্মগ্রন্থের লেখক হরিনাথ মজুমদার ধর্মজগত কি সাহিত্যেক্ষেত্রে 'কাঙাল হরিনাথ' নামেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিচিত ছিলেন। জাতির নবজাগরণের প্রথমদিনে বাংলার ঘরে ঘরে সাংবাদিকতা , সাহিত্য ও সংগীত, অধ্যাত্মসাধনা, সর্বোপরি অন্যায় অত্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। গ্রামের দরিদ্র কৃষক প্রজা ও অসহায় মানুষ তাঁকে 'দেবতা' বলে ডাকত এবং দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁর জীবন দুষ্ট জমিদার মহাজনদের নিযুক্ত দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও গুণ্ডার হাত থেকে যে একাধিকবার রক্ষা পেয়েছে তার জন্য দরিদ্র কৃষক ও প্রজাপুঞ্জের ওই 'দেবতা জ্ঞান' অনেকখানি কাজ করেছে। প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্যসামন্তও কাঙালের অমূল্য জীবনরক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।

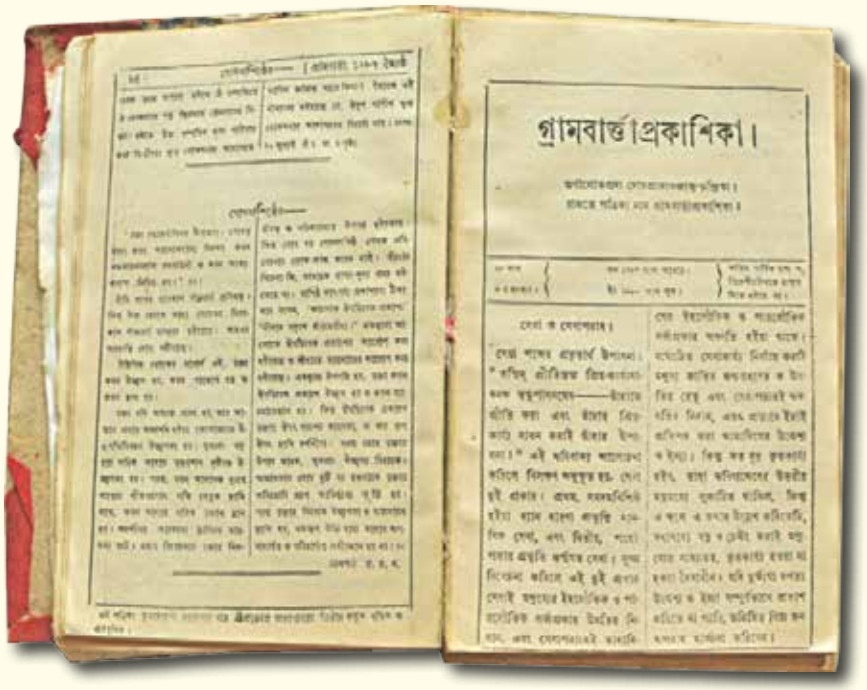

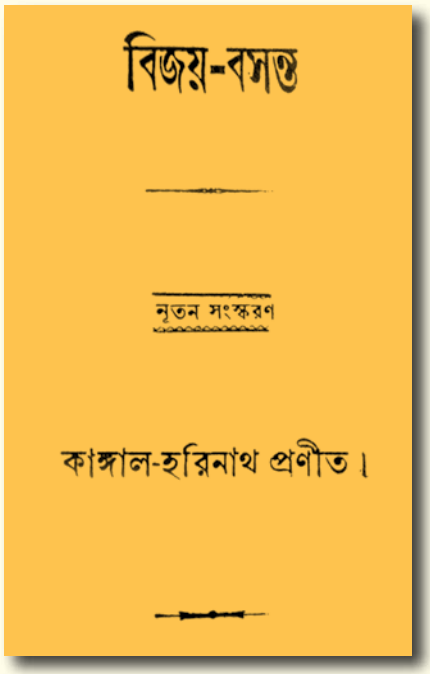

কাঙাল লিখিত অনেক গান আজও উভয়বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার মুখে প্রবাদবাক্যের মত উচ্চারিত হতে শোনা যায়। এমনকি উৎকলবাসীদের মুখেও কাঙালের গান আজও শোনা যায়। বেশি দূর নয়, কলকাতার বউ বাজার স্ট্রিটের ওপর অফিসের ক্লান্ত মানুষ যখন ঘরে ফেরে তখন এক ওড়িয়া অন্ধ ভিখারী পথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত– 'হরি, দিন ত গেল, সন্ধ্যে হল পার কর আমারে,/ তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে...' কাঙালের এই প্রসিদ্ধ গানটি গেয়ে আজও প্রতিদিন পথ চলে। কিন্তু এইসব ভাবের ও গানের স্রষ্টা কে, কী তাঁর নাম, কী তার পরিচয়, আজ আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। স্রষ্টাকে ভুললেও তার সৃষ্টিকে কিন্তু ভুলিনি। ভুলতে কি পারি কাঙালের সেই মাকে ডাকার ব্যাকুল হৃদয়ের গান– 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে/ তবে কি মা এমন করে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে।'

বাঙালি জাতি সেদিন নতুন প্রভাতের দ্বারে, জাতীয়তাবোধ তখন সবে জাগো জাগো করছে, এমন দিনে কাঙালের কালিকলম নবজাগরণের বার্তা ঘোষণা করে চলল কী গানে কী সংবাদপত্রের হেডিংয়ে হেডিংয়ে। কালিকলম ছাড়াও তিনি প্রত্যক্ষভাবে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসংগঠনে ব্রতী ছিলেন। তাঁর এসব গান জাতীয়তাবাদ তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল। ভেবে দেখবার মত যে, এসব গান সেদিন কী ধর্মমন্দিরে কী জাতীয় যজ্ঞশালায় আকুলকণ্ঠে গীত হয়েছে– 'এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্যসন্তান/ যার তপবলে, যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ।'

ধর্মের নামে জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করা ধর্ম নয় বরং অধর্ম। কাঙাল হরিনাথ তার প্রতি সাবধান বাণী প্রচার করেন *গ্রামবার্ত্তার* পৃষ্ঠায়, সংগীত রচনা করে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন–

শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হত চিরদিন ভারত শক্তিপূজে
শক্তিহীন হত না।
কাঙাল কয় কাতরে জাতবিচারে শক্তিপূজা হয় না,
সকল বর্ণ এক হয়ে ডাক মা মা বলে
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।

হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কত সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ! কিন্তু কারা এই সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়? শাক্ত-বৈষ্ণব নিয়ে সেদিন সমস্যা কি কম ছিল– তাদের বিদ্বেষ হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের তুলনায় কিছু কম ছিল না। সেই শাক্ত-বৈষ্ণবের বীভৎস দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আজ গল্পের মত শুনতে লাগে। আজ শাক্ত-বৈষ্ণবে বৈবাহিক ক্রিয়া পর্যন্ত সাদরে গৃহীত। শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন-প্রচেষ্টায় কাঙাল হরিনাথের পাঁচালী *কৃষ্ণকলিলীলার* 'দেখ ললিতে আচম্বিতে শ্যাম যে অমার শ্যামা হল' গানের অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষেও তার চিত্ত বিচলিত হয়েছিল–

জাতির নামে ধুয়া তুলে
(দিচ্ছ) খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে'
এজাত যে জাত মারবার কল,
নদীর জল করছি পান
একই জমির খাচ্ছি ধান
একই ভাষায় গাইছি গান,
ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে
(তারা) শয়তানের দল।

তাই জানতে ইচ্ছা হয়, আজও যারা এ সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়, তারা কারা? ধর্মই যাদের জীবনের সবকিছু, সেই ধর্মবেত্তারা তো এরকম চাননি। কাঙাল হরিনাথের সাথে হাজার হাজার শিষ্যের প্রিয় লালন ফকির দাঙ্গা করেননি, বরং তাঁদের মাঝে ভাবের আদানপ্রদান চলেছে। কাঙালের জীবনরক্ষায় লালন ফকিরের কত একাগ্রতা, আবার সোনাবন্ধু সাহেবের দরগা রক্ষা করতে কাঙালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমরা ভুলতে পারি না।

হরিনাথ মজুমদারের জন্ম তৎকালীন নদীয়া জেলার কুমারখালী শহরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে (১২৪০ শ্রাবণ, ইং ১৮৩৩)। পরবর্তীকালের ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের মত তিনিও দারিদ্র্যের কারণে অধিক বিদ্যার্জনে সক্ষম হননি। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় স্নেহবঞ্চিত এই বালক দুরন্ত হয়ে উঠবার যথেষ্ট অবকাশ পান। তাঁর শৈশব জীবনের উদ্দামতা পরবর্তী জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। হরিনাথ ব্যক্তিগত জীবনে সহসা কোন বন্ধন স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বাল্যে যিনি ছিলেন মুক্তগতি বন্ধনহীন দুরন্ত ঝর্নার মত, যৌবনেও তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী হয়ে থাকতে ভালবাসতেন।

হরিনাথ তরুণ বয়সে এক প্রতাপশালী মহাজনের সেরেস্তায় সরকারের পদ গ্রহণ করেন। একদিন মহাজন তাকে একখানি জাল খত তৈরি করতে নির্দেশ দিলে তিনি সেই নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। হরিনাথের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আবার নির্দেশ করলে হরিনাথ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যে কাঙাল সেই কাঙালের পদে ফিরে আসেন। হরিনাথ দরিদ্র, অর্থের প্রয়োজন তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু অন্যায় অত্যাচারের কাছে তিনি কোনদিনই মাথা নত করেননি।

সে-কালে বাংলার গ্রামে গ্রামে নীলকুঠি ও নীলকর সাহেবদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। হরিনাথ যৌবনে ৫১টি কুঠির হেড অফিস কুমারখালীর

নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচার, জমিদারদের প্রজাপীড়ন, মহাজনদের জালিয়াতি, ধর্মের নামে অনাচার ও কপটতা প্রভৃতি কীসে বন্ধ হয়, সেই চিন্তা তাঁর আহার-নিদ্রা কেড়ে নেয়। কী গ্রাম কী নগর– হরিনাথ নিদারুণ মর্মবেদনা নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান।

নীলকুঠিতে চাকরি নিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ প্রখর থাকায় নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন প্রত্যক্ষ করে অল্প দিনের মধ্যেই নীলকুঠির কর্ম পরিত্যাগ করেন। তখন কুঠির সাহেবদের পক্ষ থেকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও উচ্চ সম্মানের পদ গ্রহণের জন্য তদারক শুরু হয়। এতে হরিনাথ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচার, জমিদারদের প্রজাপীড়ন, মহাজনদের জালিয়াতি, ধর্মের নামে অনাচার ও কপটতা প্রভৃতি কীসে বন্ধ হয়, সেই চিন্তা তাঁর আহার-নিদ্রা কেড়ে নেয়। কী গ্রাম কী নগর– হরিনাথ নিদারুণ মর্মবেদনা নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। পাশাপাশি চলে নিবিড় অধ্যয়ন। বিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি, কঠোর অধ্যবসায়ে তিনি ক্রমে সে-সব বিদ্যা আয়ত্ত করেন। এ সময়ে তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তর সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রজাসাধারণের দুঃখ ও অভাব কাহিনি সাধারণের গোচরে আনবার জন্য 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখতে আরম্ভ করেন। সে সময় জমিদাররা নিজেদেরই প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা বলে মনে করতেন, ফলে কারণে-অকারণে তাদের যৎপরোনাস্তি নির্যাতন ভোগ করতে হত। এসব অত্যাচার অভাব-অভিযোগের বিবরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তগত হলে তিনি তা সযত্নে প্রভাকরে প্রকাশ করতেন।

প্রভাকরের সাহচর্যে আসায় পত্রিকা সম্পাদনাকাজে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অত্যাচার বন্ধের মুষ্টিযোগ স্বরূপ একখানা পত্রিকা প্রকাশের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁকে বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করে নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ হরিনাথ *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। জমিদারদের হাতে অত্যাচারিত দরিদ্র এবং অসহায় প্রজার পক্ষাবলম্বন করে হরিনাথ এ পত্রিকায় সংবাদ-প্রবন্ধাদি লিখতেন।

"ইহা যে শুধুমাত্র জমিদার মহাজন এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগ স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, প্রজার গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ থাকিত, তদনুসারে কার্য করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। তৎকালে *সোমপ্রকাশ* এবং *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা ছিল।"

পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলার ঠাকুর পরিবার দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল এবং পাঞ্জাবি গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে হরিনাথকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. হামফ্রি হরিনাথকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এসবে হরিনাথ বিন্দুমাত্র ভীত হননি।

হরিনাথ অদৃষ্টবাদী এবং ঘোরতর আস্তিক ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গান ও কবিতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কাছে কোন আবিলতা বা ভান ছিল না–

কেঁদে বলে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙাল,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যার বুদ্ধির কৌশলে।
আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখবে আছেন তিনি ভাবতেও কিছুই হবে না...

ধর্ম নিয়ে কতরকমের হীনতা, কপটতা, পাপাচার চলে। হরিনাথ তার প্রতিও সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সকাতরে লিখেছেন–

পাপেতে পৃথিবী খার ধর্ম্ম তথা নাহি আর,
কপটতার ধর্ম সাজে পৃথিবী ঢুকিয়া আছে,
ধর্ম যদি চাও ভাউ ধর্ম সাজে কাজ নাই
কপটতা পরিহর ভাল হও ভাল কর...

গ্রামবার্ত্তার নির্ভীক হরিনাথ কী সংবাদপত্রজগতে কী ধর্মজগতে অনেক বড় একথা স্বীকার করতেই হবে। একদিকে ধর্মপ্রাণ বাউল কবি, অন্যদিকে সাংবাদিক, এরকম সাধারণত দেখা যায় না। দেশের অগণিত নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য দরদ ও সেবাপরায়ণতা হরিনাথকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কৃষক বিদ্রোহের তিনি ছিলেন সার্থক প্রতিভূ।

হরিনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা *বিজয়-বসন্ত*। কাহিনিটি রূপক আকারে আজও প্রচলিত আছে। তৎকালে *বিজয়-বসন্ত* বাংলা সাহিত্য আসরে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হরিনাথের জীবদ্দশাতেই এর কুড়িটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির জন্য তিনি দেশের বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অভিনন্দন ও পুরস্কার লাভ করেন।

হরিনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় বিষয়। হরিনাথ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর দু'চারটি প্রবন্ধ লিখে কর্তব্য শেষ করেননি, নিজের বাড়িতে মেয়েদের জন্য স্কুল করে নিজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে ব্রতী হন। এ নিয়ে তাঁকে অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি যা ভাল, যা উচিত, যা সত্য বিবেচনা করেছেন, সে কাজে কোন প্রতিবন্ধকতাই মানেননি। যে যুগে মেয়েদের তো দূরের কথা, ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিও লোকে উদাসীন ছিল, সে যুগে হরিনাথ নিভৃত গ্রামের বুকে প্রথমে ছেলেদের, পরে মেয়েদের জন্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। আজও মেয়েদের সেই বিদ্যালয়টি তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা করছে। তিনি নানা কর্মব্যপদেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন কিন্তু যেখানেই গেছেন সেখানেই তিনি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরের সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর চেষ্টায় বাংলার কত গ্রামে কত বিদ্যালয় যে সংস্থাপিত হয়েছে, তা আজ নির্ণয় করে বলা যাবে না। কিন্তু বহুকালের বিদ্যামন্দিরগুলির প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর অনেকগুলির প্রতিষ্ঠার মূলে কোন না কোনভাবে হরিনাথের প্রচেষ্টা জড়িত আছে। নিভৃতে কাজ করতে যাঁরা ভালবাসেন, হরিনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য একথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগীদের প্রতিও তিনি অত্যুচ্চ আদর্শের নিদর্শন রেখে গেছেন। স্কুল ইনস্পেক্টর হরিনাথের বেতন ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেলে তিনি সেই টাকা স্কুলের শিক্ষকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর উদার মনোভাব ও নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, সুসাহিত্যিক জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মীর মশাররফ হোসেন প্রভৃতি কৃতী ব্যক্তি হরিনাথের সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। হরিনাথের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা তাঁরা জীবনের পাথেয়রূপে জ্ঞান করেছেন। হরিনাথ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সবাইকেই সমান স্নেহ করতেন। তাঁরাও হরিনাথকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। সে যুগের অনেক নবীন লেখকই হরিনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রেফুল করিম
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

লেখক-কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ

ভারত বিচিত্রার সকল কবি-লেখক-প্রদায়ক-অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, আপনাদের পাঠানো যাবতীয় রচনার সঙ্গে পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইলসহ ব্যাংক একাউন্টের নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। এখন থেকে আপনাদের নামে ভারতীয় হাই কমিশনের কোন চেক ইস্যু করা হবে না। আপনাদের সম্মানী সরাসরি আপনাদের ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। কাজেই উল্লেখিত তথ্য নির্ভুল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। এতদ্‌সংক্রান্ত ভুলের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না।
– সম্পাদক, *ভারত বিচিত্রা*

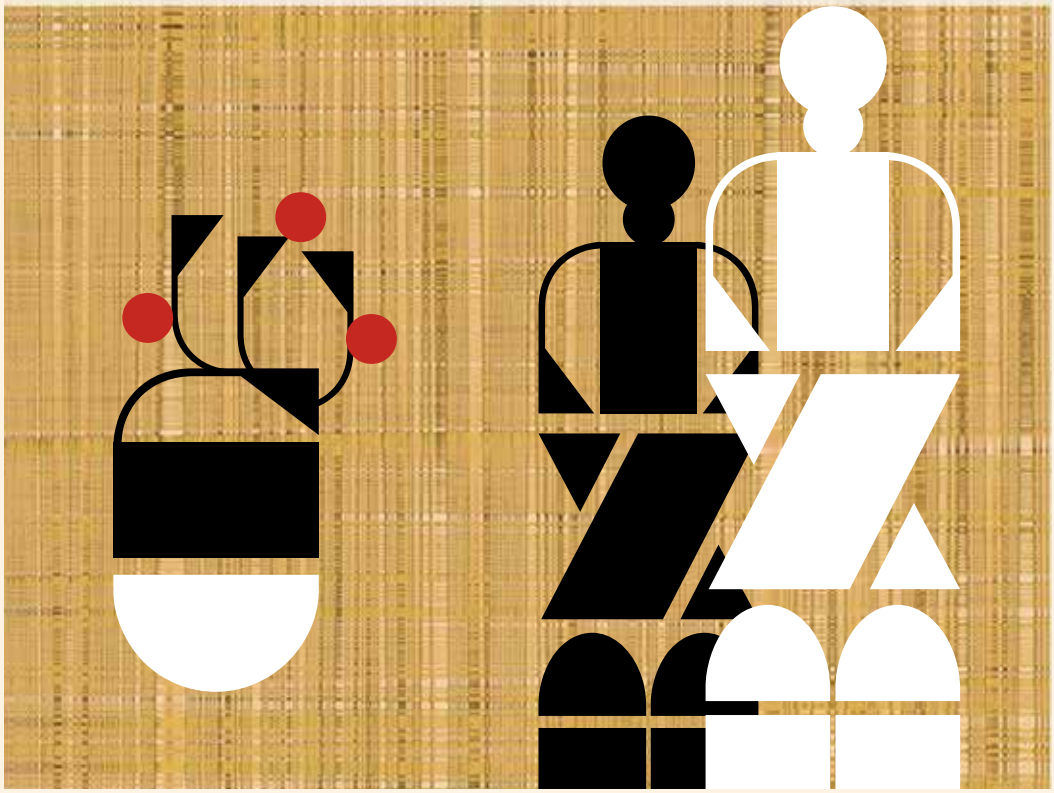

অনুবাদ গল্প

জোয়ার-ভাটা

গৌরী দেশপাণ্ডে

ডিনার শেষ হলে আমি ডিশগুলো তুলে কাজের মেয়েটার উদ্দেশে বাইরে রেখে এসে টেবিলে কফি আর কমলা পরিবেশন করলাম। রান্নাঘরে তরিতরকারি খাবারদাবার ছড়ানো। গরমে আমার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে রাজা আর বিমলা গল্প করছিল। তাদের আলাপের মাঝে আমার নাক গলানোর ইচ্ছে ছিল না। আমাদের বেশ কয়েক বছরের বন্ধুত্ব আর সৌহার্দ। কয়েক মাস পরে রাজা আজ সকালে আমাকে ফোন করে জানায় তারা আজ লাঞ্চ করতে আমাদের এখানে আসছে। রাম বাইরে গেছে ভেবে আমার ভালই লাগল। তাহলে আমরা তিনজন মারাঠি ভাষায় মন খুলে গল্পগুজব করতে পারব। আমরা তাহলে সারাটা দিন আমাদের শৈশব, ঘর-গৃহস্থালি আর পাহাড়ি জীবনের পুরনো দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে মজাই পাব। রামকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমি আমার পুরনো বন্ধু রাজা বিশেষ করে বিমলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। আমার জীবনে রামের উপস্থিতির কারণে আমি ওদের থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন! রামের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার তিন-চার বছর আমরা কেউ কাউকে অপছন্দ করেছি বলে মনে পড়ে না। রাম মারাঠিভাষা না জানায় সে ইংরেজি না হয় হিন্দিতে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে রাম নিজেকে সুন্দরভাবেই তুলে ধরতে পেরেছে। সে যে-কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ওস্তাদ, শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই মাঝেমধ্যে খাপছাড়া ভাব করে।

আমার মনে হল আমি যেন সিনেমা দেখছি। বিমলার কাছ থেকে কমলার একটা কোয়া নেবার জন্য চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাঁ-হাতটা চেয়ারের ওপর রেখে ডান হাতটা বিমলার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। রাজা বলল, 'শোন প্রিয়ে।' আমি আমার হাতটা সরিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলাম। সে আগে মাঝেমধ্যে আমাকে প্রিয়ে বলে সম্বোধন করত। আমি এক সময় তার মুখ থেকে এই সম্বোধনটা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম।

রাজা বলল, 'আজ আমরা তোমাকে কিছু কথা বলতে এসেছি।' চেয়ারের ওপর হাত দু'খানা রেখে ইতস্তত ভাব দেখালাম। আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে লাগল– কী কথা তারা আমাকে বলতে চায়। সে সম্ভবত রাম সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবে। তারা রামের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতে পারে। কীভাবে জানল যে, রাম আজ বাসায় নেই? সে যে বাসায় নেই সে কথাটা অবশ্য রাজা জানে। যাহোক, তারা হয়তো তার সম্বন্ধে কিছু বলবে না। আমি এর মাঝে ওখান থেকে উঠে পড়লাম। বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরলে আমি কিছু বলতে গেলে সে বলল, 'রাজা দয়া করে থামো, ভগবানের দোহাই!'

রাজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিমলা, তাকে অবশ্যই বিষয়টা জানাতে হবে। জানার পর সে কী করবে সেটা তার ব্যাপার। কথাটা কেউ না কেউ এক সময় তাকে বলবেই। অন্য কেউ রঙচঙ লাগিয়ে তাকে বিষয়টা বলার চেয়ে আমাদেরই বলা ভাল হবে।' আমি তার কথা শুনে আবার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। রাজাকে পাত্তা না দিয়ে বিমলার দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ঘটেছে? রাম কি তোদের ঠকিয়েছে?'

রাজা আবার আমার দিকে তাকালে আমি তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালাম। আমি কিসের যেন একটা ভয় পেলাম। রাজা নিচু কণ্ঠে বলল, 'না, সে আমাদেরকে ঠকায়নি। ঠকিয়েছে তোমাকে।'

'ওহ এই কথা!' আমি তিক্ত কণ্ঠে তাকে বললাম।

রাজা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, 'এই কথাই ঠিক। আর আমি এটা পছন্দ করি না। সে কেন এমনটা করতে পারল। কেন সে তোমার সাথে এমনটা করল? তুমিই-বা কেন এখন সেই কথাটা শুনতে চাচ্ছ না।'

রাজা ততক্ষণে বসে পড়েছে। বিমলা কড়া গলায় বলল, 'রাজা, রাজা!'

'আমি বুঝতে পারছি না বিনা অপরাধে কেন একটা মেয়ে এভাবে শাস্তি ভোগ করবে? কেনই-বা স্বেচ্ছায় সে ভোগান্তির শিকার হতে চায়? কেন সে দুঃখকে মাথা পেতে নেবে?' রাজা পাগলের মত নিজে নিজে বলে যেতে থাকল। নাটকীয় আবেগে সে ফেটে পড়ার জন্য আমি হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তার হয়তো মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সে এবার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'হাসির কিছু নেই, হয় তুমি অন্ধ, না হয় একটা নির্বোধ, আর তা না হলে অন্য কিছু। আমি নিজে ওই কথা বলতে চাচ্ছিলাম না।' বিমলা আবার রাজাকে থামানোর জন্য বলে উঠল, 'রাজা যথেষ্ট হয়েছে। ওর সাথে আমাকে কথা বলতে দাও।'

তারা আমাকে কী বলতে চাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে আমি বিমলাকে বললাম, 'তুই কী বলতে চাস? আমি এমন কী অপরাধ করে ফেলেছি, যা তুই আমাকে গোপনে বলতে চাচ্ছিস? যা বলবি বলে ফেল।'

বিমলা আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে মিনমিনে স্বরে স্পষ্ট করেই বলল, 'তিন মাস আগে রাম বিয়ে করেছে...' অবাক হয়ে আমি কৌতূহলের সঙ্গে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে?'

রাজা আমাকে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল, 'মূর্খ, নির্বোধ! এমন একটা ভয়াবহ কাণ্ডের পর তুমি প্রশ্ন করে বিষয়টা যাচাই করতে চাচ্ছ! তুমি কি বুঝতে পারছ না, তুমি এখন কোন অবস্থায় আছ? তোমার কি কোন দিনই বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না?' রাজার চোটপাটকে অগ্রাহ্য করে বিমলা আমার প্রশ্নের উত্তর করল, 'নির্মলা সাংঘভিকে।'

'বিমলা! হায় ঈশ্বর! মহিলারা!'

বিমলা রাজার কথায় বিরক্ত হয়ে তাকে চুপ থাকতে বলল। রাজা নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমি বিমলার কথা শুনে নিথর হয়ে গেলাম। ভেবে অবাক হলাম রাম কীভাবে জীর্ণশীর্ণ শরীরের একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারল।

রাজা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠল, 'আমাকে বল এখন তুমি কী করবে?'

বিমলা যেমন সপ্রতিভ, তেমনই সহিষ্ণু। সে বলল, 'রাজা, এখন চল আমরা বাড়ি যাই। এ বিষয়ে ওকে নিজেরই সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত।'

রাজা আবার নানা কথা বলে তার রাগ প্রকাশ করতে শুরু করল। আমার নীরবতা আর বিমলার নিষেধের ফলে রাজা শেষপর্যন্ত মুখ বন্ধ করল। তারা চলে যাবার আগে বিমলা আমাকে বলল, 'সোমবার আমাকে রিং করিস।' আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম। একবার আমার মনে হল ওরা এই মুহূর্তে যেন চলে না যায়। পর মুহূর্তেই মনে হল ওদের থাকার প্রয়োজন নেই।

রাম যাবার সময় বলে গিয়েছিল যে, সামনের দু'দিন শনি আর রবিবার, তাই তার রবিবারের আগে ফেরবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেজন্য আমি একাই বাসায় ছিলাম। কোন সমস্যায় পড়লে আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করি, এটাই আমার স্বভাব। সবকিছু ভালভাবে না জেনে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিই না।

অনেক কথাই আমার মনে পড়ল। তিন-চারমাস আগে রাম হঠাৎ করে নির্মলার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে সে অফিসের শেষে আমার বাসায় আসতে শুরু করে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো আমার বাসায় কাটাতে থাকে। আমার মনে পড়ল, একটা পার্টিতে নির্মলার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা সবাই বুঝতে পারি নির্মলার জ্ঞানগম্মি বেশ কম। পার্টিতে সে এক কোণে বসে ছিল। ওই রাতেই আমি রামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি এ ধরনের সঙ্গী নিয়ে কীভাবে চলাচল কর?' ওর কি কোন বিষয়ে লেশমাত্র জ্ঞানগম্মি আছে?'

আমার কথায় রাম রেগে গিয়ে বলেছিল, 'প্রত্যেকেই তো তোমার মত সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী নয়!' রামের কথার ধরনে আমি ব্যথিত হয়েছিলাম। রামের কথার পিঠে আর কোন কথা বলিনি। এতে রামেরই জিত হল। আমি তার কাছে নির্মলার প্রসঙ্গ তোলা থেকে বিরত থাকলাম। রাম আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসা বন্ধ করে দিল। রাজা, অজয়, বিহারী, সরল, এ্যানির সঙ্গে আমি সিনেমা কিংবা খেলা দেখতে যেতে থাকলাম। রাম শুধুমাত্র হিন্দি ছবি দেখত। হিন্দি ছবি ভালবাসলেও আমরা তার সঙ্গে সিনেমায় যেতাম না। রাম আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করত। কোন দিন বলত যে সে আমার বাসায় ডিনার করতে পারছে না, আবার কোন দিন আগেভাগে আমার বাসায় যাবার কথা জানিয়ে আসত। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ছুটির দিনগুলো কাটানোর ব্যাপারে তুমি কি কোন প্লান করেছ? আমি তো ছুটিতে দিল্লি যাবার কথা ভাবছি।' আমি বললাম, 'আমি আমার বোনকে কথা দিয়েছি তার সঙ্গে লোনাবানাতে থাকব। তার ডেলিভারির দিন প্রায় এসে গেছে। আমি তার কাছে থাকলে সে খুশি হবে।'

এখন আপনারাই বলুন, এ ঘটনার জন্য আপনারা আমাকে কীভাবে দায়ী করবেন? আমার স্বভাবটাই এমন যে, আমি কোন ঘটনায় অল্পেই ভেঙে পড়ি না। আরেকটা কথা, রাম ও আমার মধ্যে অলিখিত আর অকথিত একটা বোঝাপড়া আছে। একসাথে থাকার ইচ্ছে যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা একসাথে থাকব, একসাথে থাকার ইচ্ছেটা যেদিন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে আমরা আলাদা থাকব। রাম আর আমি অনেক বিষয়েই খোলামেলা আলাপ করেছি। আমাদের আলোচনার মধ্যে কেউ মাথা ঘামাতে আসেনি। আমি কখনও ভাবিনি রামের মনে কী লুকানো থাকতে পারে! সে কী কখনও আমার প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে! সে যখন আমার সাথে থাকবে না তখন কী ঘটতে পারে! ভাগ্যের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমোতে যাবার আগে মনে মনে বললাম, 'বিষয়টা আগামীকাল ভেবে দেখা যাবে।'

সপ্তাহের বাকি দিনগুলো পড়ে আছে সামনে। শনিবারে অমৃত আর তার বাবা-মা এসে আমার সঙ্গে ন্যাশানাল পার্কে যাবার কথা বললে তাদের সঙ্গে সারাটা দিন গাড়িতে পিকনিকে ঘুরেফিরে গল্পগুজব আর হাসিঠাট্টায় কেটে গেছে।

রাতের বেলা ওয়ার্ড্রোব পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম। এক সময় আমি ভাবার চেষ্টা করলাম, এখন যদি আমি রামকে আমার এখানে আসতে

নিষেধ করি তবে কেমন হবে! তাকে আসতে নিষেধ করার কারণ সে নির্মলাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু কারণটা ধোপে টিকবে না। অন্য কাউকে বিয়ে করলে আমাদের সম্পর্কের অবনতির কারণ হতে পারে না। যদি সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিত, আমি তাকে তার নিজের পথ দেখতে বলতাম। তবে কেন বেচারা অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না? নির্মলা? সে ইচ্ছে করলে নির্মলা বা অন্য কোন মেয়েকে কি বিয়ে করতে পারত না? কেন তবে সে নির্মলাকে বিয়ে করতে পারবে না? আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিয়ে বহির্ভূত। বিয়েটাই কি ভালবাসার নিদর্শন? নির্মলা ছাড়াও সে আরও দু'জন মহিলাকে ভালবাসতে পারে। কেন পারবে না!

মিডিল ক্লাস রোমান্টিক বুর্জোয়াদের কাছে বিয়েটা কি ভালবাসা? আমি কি এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারি? ভালবাসা কি দু'জন মানুষের পারস্পরিক সমঝোতার ব্যাপার, আর অন্যদিকে বিয়েটা কী সমাজ আর আইনের বন্ধন নয়? তাহলে দু'জনের সম্পর্কের মানদণ্ড কোনটি? ভালবাসা হচ্ছে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মত, তা কি দেওয়া-নেওয়ার প্রেক্ষিতে হ্রাস পেতে থাকে? রাম তার সারা সময়ের অর্ধেকটা সময় আমার সঙ্গে কাটায়। এখন এই চিন্তাটা মাথায় আসছে, এরপর কি আমি তার বন্ধুবান্ধব, তার বাবা-মায়ের সামনে আগের মত যেতে পারব? না, আমার পক্ষে তা আর সম্ভব হবে না। পরমুহূর্তে আমার মন বলল, না, নির্মলা আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। আমার এখন আগের রাতের মত ঘুমোতে যাওয়াই ভাল। পরে এসব চিন্তা করা যাবে।

পরদিন রবিবারে আমি আমার গৃহস্থালীর কাজ সেরে খ্রিস্টমাস কার্ড নিয়ে বসলাম। কার্ডগুলোতে নাম লিখতে হবে। দুপুরের দিকে রাম এসে হাজির হল, বলল, সে দুপুরের খাবার খেয়ে এসেছে। তারপর একটা ঢেকুর তুলে বলল, 'রবিবারের বিকেলে একটা ঘুম না দিয়ে মিছেমিছে কাটিয়ে দেওয়াটা আহম্মকের কাজ!' আমি কার্ডগুলো ফেলে রেখে বিছানায় গিয়ে নিজেকে রামের কাছে সঁপে দিলাম। সঙ্গত কারণেই রাম আমার সঙ্গে অন্য কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলল না।

পরদিন সোমবার, বিমলা আমাকে ফোন করে বলল, 'তুই তো আমাকে কল করলি না?' আমি জবাব দেওয়ার আগেই সে আবার বলল, 'আজ রাতে আমার এখানে ডিনারে আসছিস কিন্তু!'

'না, আজ রাতে যেতে পারছি না।' তারপর ওর আর কিছুই বলার থাকে বলে আমি মনে করলাম না। বিমলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার কথা জড়িয়ে আসছিল। আমি ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। বিমলার সঙ্গে আমার আর তাড়াতাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না ভেবে স্বস্তিবোধ করলাম। ওর সঙ্গে আমি কি আর কোনদিন হেসে হেসে কথা বলতে পারব না? কে জানে! আমার মন বলল সে আমাকে আর কল করবে না। কিন্তু বিমলা একদিন আবার কল করে জিজ্ঞেস করল, 'তুই তাহলে কী সিদ্ধান্ত নিলি?'

আমি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বিষয়ে?'

আমার প্রশ্ন শুনে এবার সেও নীরব হয়ে গেল। আমরা পরস্পরকে অনেক অনেকদিন থেকে চিনি ও জানি, আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারপর সে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রামের বিয়ের পর তুই কী করবি বলে ঠিক করলি?'

আমি রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিলাম, 'রাম তো আমাকে এখনও বলেনি সে বিবাহিত!'

ও প্রান্ত থেকে বিমলার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম। টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দও পেলাম।

অনুবাদ মনোজিৎকুমার দাস

লেখক পরিচিতি

মারাঠি ও ইংরেজি ভাষার প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক গৌরী দেশপাণ্ডে (১৯৪২-২০০৩)-র লেখালেখির যাত্রা শুরু কবিতা দিয়ে। ১৯৬৮ সালে তাঁর ইংরেজি ভাষার কাব্যগ্রন্থ *ব্যর্থ* প্রকাশিত হয়। তিনি গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক হিসেবে সাহিত্যজগতে বিশেষভাবে খ্যাত। ১৯৭০ সালে তাঁর লেখা *লস্ট লাভ* এবং ১৯৭২ সালে *বিয়োন্ড দি স্টল্টার হাউস* গ্রন্থ দু'খানা প্রকাশিত হয়। তিনি রিচার্ড বার্টন এর ইংরেজি ভাষায় লেখা *এ্যারাবিয়ান নাইট*কে মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মারাঠি ভাষায় লেখা তাঁর *নিরগথি* উপন্যাসকে ইংরেজি ভাষায় *ডেলিভারেঞ্চ* নামে স্বকৃত অনুবাদে প্রকাশ করেন।

গৌরী দেশপাণ্ডের লেখা মারাঠী ভাষায় লেখা গল্পের বিদ্যুত অলুজকার ও লেখিকার নিজের ইংরেজি ভাষান্তর *এবটাইড্* গল্পের বঙ্গানুবাদ করা হল। এই গল্পে বিবাহিত এক পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিতা এক রমণীর লিভিং টুগেদারের কাহিনি বিশেষ অনুষঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

যখন বসন্ত

শেখ সামসুল হক

হাওয়ায় নাচে দূরের বনোভূমি
নির্ঘুম রাতের বিরল দৃশ্যাবলি ছুঁয়ে
বসন্ত এসেছে এইতো একটু আগে
তাইতো এমন করছে মনোরাজ্য জুড়ে
অন্য কিছু নয় তারপরও কিছু
একটা আলাদা ভাবের চলমান গতি
কানাকানি করে বেড়ায় খুব কাছে
দেখতে পাইনা বুঝতে পারি অনায়াসে
ভাল লাগে ভাল লাগেনা এমনটা
ভেতরে বাইরে চলছে ধূলি ঝড় তুলে
মজা করে কথা বলার ইচ্ছে জাগে
হঠাৎ এসব থেকে সটকে যাই যাই।

যোগসূত্র জীবনের

খোশনূর

কি করে বলি কেউ নয় আমার
কেউ নয় কারো
বরং সবাই সবার, এ কথার স্বপক্ষে
আছে হাজার সত্যতা
তাই ভালোবাসবো শ্রদ্ধা স্নেহ মমতায়
স্বপ্ন সাধে রাতদিন বাড়াবো
উদ্যানের দৃঢ়তা আর বিশ্বাসের
সুখাবেশে হবো উজ্জীবিত
জীবনের আনন্দ কতো অসীম তা জানার
অভিপ্রায়ে হবো নিবেদিত ক্ষমাশীল
শান্তিকামী নিঃস্বার্থ ঐ যে ছোট নীড়
ঐ যে অট্টালিকা গ্রাম শহর
ভালো মন্দ আলো আঁধার
দুঃখ সুখের যাওয়া আসায়
অতিবাহিত সময়; মন তো চায়না চলে
যেতে অন্য অচীনপুরে এই সংসার
ছেড়ে এরই নাম ভালোবাসা
কিঞ্চিত মোহমায়া স্ব-অস্তিত্বের শেকড়
মাটির গভীরে আছে বলেই মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত নয়
বিশ্বের সম্পূর্ণতা আমাদের নিয়েই আমরা সবাই
সবার আমরা মৃত্যুমুখী বলেই
জীবনকে ভালোবাসতে চাই আরো।

সামসুন্নাহার ফারুকের দুটি কবিতা

নোঙর

অস্থির সময়ের কথা বলতেই
কেমন কঁকিয়ে উঠলো চাঁদটা
ভরা পূর্ণিমাতেও ওর চারপাশে
ঘুরপাক খাচ্ছে অদ্ভুত কালো ছায়া
ভাঙনের বৃত্তে স্বপ্নের চারুপাঠে
স্বস্তির নোঙর খুঁজতে খুঁজতে
কৃষ্ণবিবরের কাছাকাছি এসে
হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ালো চাঁদটা
চিৎকার করে বলে উঠলো
'পাসওয়ার্ডটা' খুঁজে পাওয়া গেছে
তিলকাল আর অপেক্ষা নয়
সকাল হলেই যোগ দিতে হবে
রৌদ্র দিনের অগ্নি মিছিল।

দৃশ্যপট

একলা ছাদে ভর দুপুরে
উঠল বেজে স্মৃতির নূপুর
সেইতো আমার হারিয়ে যাওয়া
সেদিনের সেই একলা দুপুর
আজ তো প্রায় ভুলেই গেছি
শ্রাবণ ভেজা সেই নদীতট
উল্কাবেগে ছুটছি আমি
পাল্টে গেছে দৃশ্যপট
আমি এখন উড়াল পাখি
মেঘের ডানায় বাঁধব রাখী
জোছনা ভেজা শূন্যভিটায়
আঁকব রঙিন আল্পনা
রঙ ছড়াবে সুখের ফাগুন
শিমূল পলাশ জ্বালবে আগুন
আউলা বাউলা বাজবে বেহাগ
যখন আমি থাকব না

ঘরহীন ঘর

রীনা তালুকদার

অতৃপ্ত জীবনের সুখ খোঁজা যাযাবর পাখি
শূন্য লতায় বাঁধে হলুদ আশার অঞ্জলি
কে বলে অমল সুখ আছে নির্মল ভুবনে
ধূসরিত আলো আঁধারি ছবি দূরে দূরবীণ আঁখি

সুখ তো– আকাশ মাটির মিতালী প্রতিবিম্ব আয়নায়
অসুখের আগুনে পোড়ানো একরোখা দিয়াভূত
তন্ন তন্ন খুঁজে বেড়ায় নির্মেদ স্বপ্নে হীরামন
ঘর থেকে বের হয়ে ফের ঘরহীন ঘরেই ফিরে যায়।

এপিটাফে নিবেদিতা

রোকেয়া ইসলাম

নিবেদিতা–
অন্তরালে অব্যক্ত জাতিস্মর
আকণ্ঠ ডুবে যাই অগাধ জলে,
শ্রাবণ ধারাপাত, আকাশের স্বপ্নজ্বর
মেঘলোকে শুনিয়েছিলে জোছনার নামতা...

চোখ রাখি জীবনের অসমাপ্ত কাব্যে
দীর্ঘকাল মহুয়া মাতাল আজন্ম পাঠে
সেই চেনাজানা মানুষের গল্প
গোধূলির গায়ে ছিল না আমন্ত্রণ লিপি
তবুও বাড়িয়ে থাকি পা,
সহস্রাধিক প্রাণের অন্ধ বাতাস কাঁদে
শুনছ নিবেদিতা?

ধ্বনি মেঘ হয়, বাতাস আর কুয়াশায় দূর প্রাঙ্গণে
ভাষা বৃক্ষে নবীন পাতার ঘ্রাণে তৃষ্ণার্ত বৃষ্টি
অনিন্দ্য মুদ্রণ ঠোঁটে ভেসে যায়– স্বপ্ন
নদীতটে সাতসমুদ্রের অজস্র পথরেখা
আইরিশ জল রঙে নিবেদিতার বিষণ্ন দৃষ্টি...

জলের উপর আলোর প্রক্ষেপণ– তুমি, নিবেদিতা
চিত্রকলায় শুদ্ধ বিলাবল, সংগীতে গৌড়ীয়
সাহিত্যে মাটিগন্ধা ফাগুন
মেঘসিক্ত আকাশ ডেকে যায় মনের গহীনে
কি নাম? কি পরিচয়?
বাগবাজারের ফিরিঙ্গিদুহিতা...

এস গোলাপ ফোটাই
ভারতবর্ষের এককোণে– এই শহর কলকাতায়
এ যেন গত জন্মের বাস
স্পর্শে বিজড়িত পথচলা
যতটুকু ছিল আত্মায়, ঢেলে দিলে ততধিক
নিবেদিতার দীর্ঘশ্বাস...

গঙ্গাজলে ধুয়ে গেছে প্রাণ, সাবেকী কিছু অভিমান
হ্যালোজেন বাতিতে ভোর নেমে আসে– প্রতিজ্ঞা ধর্মোপাসনা

সে

সরকার মাসুদ

আকাশে একটা পাখি ঘুরতে ঘুরতে উড়ে গেল
মেঘ আর বাতাস হাত ধরাধরি করে চলেছে কোথায়!
তারা এখন খুব নিচু স্বরে কথা বলে

লাল ঝিলমিল আলো বৈকালিক ঝর্ণার গায়
শাদা দেয়ালের ওপারে পাহাড়ের ছবি সে দেখবে না
শুনবে না মেঘ আর সহযোগী বাতাসের মৃদু স্বর
ছিটপোকা ঘুরে ঘুরে পানিতে আলপনা একে চলে।

সে দেখবে এ পৃথিবী ভংগুর টিলায় প্রশ্নকাতর
ঝরা সবুজের মাঝখানে গোলপাতার ঘর
কেন ফুলের উপর পড়া প্রজাপতির ছায়া নয় অবিনশ্বর?

চির অপরিচিত

কনক চৌধুরী

কচি কলাপাতার যেদিকটা রোদ আড়াল করে রাখে
তার সাথে লক্ষ কোটি বৎসরের রোদে পোড়া
আকাশ রংটার অনেক মিল।
আর রোদে পুড়ে আমি হই কৃষ্ণকায়।

সাদৃশ্যে ও ঐকতানে

হাসান হাফিজ

একদিকে ঢাকার বাংলাবাজার।
আরেকদিকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট।
কোথায় যেন একটা মিল। কোথায় যেন একটা সুরের ঐকতান।
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ। উহ! ফুলের গন্ধের চেয়েও তীব্র।
এই যে মাদক নেশা সুরভিত অস্তিত্বে, মননে। আলোর উচ্ছ্বাস।
চাঙ্গাড়ি ভর্তি করে চলছে বই আনা-নেওয়া। দু'দেশেই এক দৃশ্য।
বইয়ের শরীরে-মনে একই ভাষা। বাংলা ভাষা। রক্তে যা রঞ্জিত।
ভাষা যেন নদী এক। সীমান্ত, কাঁটাতার, রক্তচোখ বিধি ও নিষেধ
কেন সে মানতে যাবে। তার কোন ঠেকা তো পড়েনি!

বাংলাবাজারে প্রায়ই যাওয়া হয়। কলেজ স্ট্রিটের ঠাঁই মেরুদূর।
পাসপোর্ট-ভিসা লাগে। রাজনীতি-কূটনীতি কত কিছু আছে।
মনের দুয়ার কিন্তু খোলা সর্বদাই। সেইখানে এইসব নীতি-ফীতি
সমস্ত অচল। মানুষের মনে কেউ তালা দিয়ে রাখতে পারে না...

ছোটগল্প

রমাকান্তর প্রেম

তৃপ্তি বালা

রমাকান্তর জীবনে সেই এক সময়! কৈশোর কালই। সব মানুষেরই কী এমন হয়, কতবার ভেবেছে রমাকান্ত। হয়তো হয়। হয়তো না। সে যা হোক, সেই এক সময় তার জীবনে! শারদীয়া উৎসবের ঠিক আগে আগে হঠাৎই একদিন সেই যে ছাপ এঁকে দিয়েছিল মনের মধ্যে, তারপর থেকে কতগুলো দিন মাস, এমনকি বছর পার হয়েছে একেবারে যেন হারিয়ে গেছে সে। শারদ দিনের সেই বিকেলে কুমার নদের পাড়ে শিব মন্দিরের গা ঘেঁষে ছোট্ট দোতলা যে বাড়িটা, তারই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। কেমন কোমল, মায়াবী একখানি মুখ! উৎসবের ঠিক আগে হঠাৎই সে মুখ মনের মধ্যে যে ছাপ ফেলে গেল, রমাকান্তর পক্ষে তা ঠিক বলে বোঝানো সম্ভব নয়। শুধু মনে আছে, তারপর থেকে কতগুলো দিন শুধুই এক মুখদর্শনের আশায় চলে গেছে তার। প্রত্যেকটি বিকেলে, তারপর থেকেই নদীর পাড়ে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। কখনও একা, কখনও সঙ্গে কেউ। অদ্ভুত কোমল মুখটি নিয়ে কি যে ভেবে চলেছে মেয়েটি, যেন যক্ষপুরীর রাজকন্যা! রমাকান্তর মনে শুরু হয়েছে তাই নিয়ে কত কল্পগাথা। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে যা প্রধান হয়ে উঠেছে তা হল, ওর সাথে দুটো কথা বলা যায় কিভাবে?

মন্দিরের পাশ ঘেঁষে কুমার নদের উপরের ব্রিজ ধরে যেতে যেতে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়– কী এর নাম? পরিচয়ই-বা কী? জানতে হবে, জানা যে দরকার খুবই।

এভাবে হয়তো বেশিদিন মনের ভার বয়ে বেড়ানো যাবে না। সহপাঠী-বন্ধু মহলে অনেকটাই রটে গেছে– রমা যে এক বিশেষ কিছুতে স্থির হয়ে তার চার-পাশ দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে! সে কী কৌতুক তাদের। অথচ সে স্থির সংকল্পে। কালিভক্ত রমা। তারপর থেকে একটু বেশিই যেন ধ্যানমগ্ন থাকে দেবীর সামনে। মিলিয়ে দাও মা, ওর নাম-ধাম-বৃত্তান্ত...। শোনেন কি মা ভক্তের ডাক? রমাই-বা কতখানি মনোযোগী থাকতে পারে মায়ের সামনে? মনে হয় যে থেকে থেকেই ঢুকে পড়ে মুখখানা। দেবী মানবী একাকার হয়ে যায় ভক্তের হৃদয়ে।

সেদিন সকাল বেলা শরীরটা খুব ভাল নেই তার। গায়ে হাত রেখে মা বলেছেন– জ্বরই এসেছে, স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। দশম ক্লাসের ছাত্রের কিছুতেই মন নেই যে বাড়িতে থাকে। তবু মা বলেছেন। সচরাচর যা হয় না, এ বয়সী ছেলেরা তো একটু অবাধ্য হয়েই থাকে। অথচ মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে না যাওয়াই স্থির করে সে। তবু যে সময়টাতে ব্যাগ কাঁধে স্কুলের দিকে যায় প্রতিদিন, জানালা দিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। হঠাৎই দেখে রিক্সাতে করে দুটি মেয়ে এবং অদ্ভুতভাবে তাদের একজন যেন সেই যক্ষপুরীর রাজকন্যা! রমাকান্ত এক লাফে উঠে বাইরে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রিক্সাটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। তবু মায়ের কথা শুনে যা সে পেল তার তুলনা নেই। বুঝে নিল সে, মেয়েটি কোন স্কুলের। তার মানে প্রতিদিন এই সময়টাতে এ পথ দিয়েই স্কুলে যায় সে। মনের মধ্যে দারুণ হাওয়া খেলে গেল রমার। অদ্ভুত এক ভাললাগার বোধ ছেয়ে গেল তাকে। মনে হল শরীর-টরিরে জ্বর-জারি আর নেই। একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবু সে ঠিক করল, কালও ঠিক এই সময়ে কোন একটা ছুঁতো করে দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে।

পরদিন সকালেই তৈরি হয়ে নেয় রমা। স্কুলের পোশাক গায়ে তার। স্কুল ফাইনালের নির্বাচনী পরীক্ষার আগে আগে বাড়িতে অনেকেই যখন মুখ গুঁজে থাকে বইয়ে, ওর তেমন ভাব নেই। পড়াশুনো সে করে কম। পরীক্ষার খাতায় মোটামুটি একটা কিছু হলেই চলে। পিতারও সে নিয়ে বিশেষ তাড়া নেই। তবে তাড়া যিনি দিতে পারতেন, কর্মসূত্রে এখন দূরে। বড়দার ভীতিই রমাকে দিয়ে যতখানি যা করিয়ে নেয়। তা নইলে একান্ত ভাল লাগার বাইরে আর কিছু হয়ে ওঠে না তার। ঘড়ির কাঁটার দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ রেখে কোনরকমে কিছু মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ে সে।

রাস্তায় মাত্রই সে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখের সামনেই রিক্সাটা, ট্রাফিকের কারণে দাঁড়িয়ে। পাশে গতদিনের মতই সঙ্গিনী একজন। খুব কাছ থেকেই আজ দেখতে পায় রাজকন্যাকে। চোখে একবার চোখও পড়েছে তার। রমাকান্তর দিকে তাকিয়েছে সে। সেই এক ক্ষণ, মনের মধ্যে কী যে হচ্ছিল! সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গিয়ে শরীরময় রক্ত ছুটে চলছিল! ওর বুকের তোলপাড় বুঝি বাইরে থেকেই তখন শুনে ফেলে কেউ!

তারপর কখন স্কুলে গিয়েছে, বাড়িতে ফিরেছে কখন– কিছুই আর মনে থাকেনি। চেতনায় কেবল রাজকন্যার দুটি চোখ! কী বলবে তাকে সে? কথা যে বলতেই হবে। কী বলবে? কীভাবে? রিক্সার উপরে বসে থাকা সহযাত্রিনীর সামনে কিভাবে বলবে রাজকন্যাকে কোটালপুত্র? ঐ এক অপরূপা মেয়ের কাছে সে তো কোটালপুত্রই। রাতে পড়ার টেবিলে বইখাতা খুলে শুধু ঐ কথাই ভাবে সে। একের পর এক কথা সাজায় মনের মধ্যে। যা তার মনে আসে, মাথার মধ্যে যা ঘুরপাক খায়– সবের তো একটিই মানে। অস্থির আবেগে উদ্বেল রমাকান্ত শেষ পর্যন্ত এক টুকরো কাগজেই লিখে ফেলে তিনটি শব্দ। একসময় কখন মাঝরাত পেরিয়ে ভোরের দিকে দু'চোখে শ্রান্তি নামে তার।

সকাল বেলা যখন টের পায়, চারপাশে আলো ঠিকরে পড়ছে। দরজার কপাটে শব্দ। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে হোঁচট খায় রমা। কপাট খুলতেই দেখে মা-জননী! তাড়াতাড়ি স্নানঘরের দিকেই ছোটে সে। সময় হাতে নেই, কোন রকম দু'মগ জল ঢেলে গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। টেবিলে মা তখন খাবার নিয়ে। ভাতের সাথে ডাল চটকে এক টুকরো বেগুন ভাজি দিয়ে শেষ করে রমা প্রাতঃরাশ। তারপর ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়ে।

দেখা যায়, দাঁড়িয়ে তিনি বারান্দায়! ওর কী কোন সঙ্গী-সাথী নেই? কোনরকম খেলাধূলাও করে না-কি ও? ভাবে রমাকান্ত। আজ জোর পণ করে সে। ব্রিজের হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে শিব মন্দিরের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাজকন্যাকে খুব কাছ থেকে দেখা যায় সেখানে।

রিক্সাটা সেদিনও এগিয়ে গেছে খানিকটা। তবে সিগনাল পয়েন্টের কাছে যথারীতি আটকেও আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় রমা। রাজকন্যাকে দেখা গেছে। এগিয়ে গিয়ে কোন রকম চিন্তা না করেই চিরকুটটি ছুড়ে দেয় সে। গিয়ে পড়ে যেন কন্যার গায়ের উপরই। সিগনাল ছেড়ে গেলে রমা দেখে, কাগজটি রাস্তায় পড়ে! সে কি ওটি ফেলে দিয়েছে, না-কি...? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রমা। কাগজটি তুলে নেবার কথা ভাবে। ততক্ষণে কতক রিক্সা, যানবাহন এসে আটকে গেছে রাস্তায়। মনের মধ্যে যারপরনাই অস্বস্তি নিয়ে হাঁটতে থাকে সে।

বিকেল বেলা খুব চেষ্টার পরও যখন পারে না, চলে যায় সেই মন্দিরের কাছে। দেখা যায়, দাঁড়িয়ে তিনি বারান্দায়! ওর কী কোন সঙ্গী-সাথী নেই? কোনরকম খেলাধূলাও করে না-কি ও? ভাবে রমাকান্ত। আজ জোর পণ করে সে। ব্রিজের হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে শিব মন্দিরের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাজকন্যাকে খুব কাছ থেকে দেখা যায় সেখানে।

নাম কী তোমার কন্যা? ছুঁড়ে দেয় কথাটি সে। ভিতরে ঢুকে যায় কন্যা। রমা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে আশায়– ফিরে যদি আসে সে আবার!

এল সে, কিন্তু পরদিন। বাড়ির সামনের রাস্তায় ট্রাফিক সিগনালে। রমা আজও হাতে এনেছে তার বার্তা– তিনটি শব্দে হৃদয়ের সবচে খাঁটি কথা। ঠিক ঠিক ছুঁড়েও দিল সে। আজ তা ঠিক গিয়ে পড়ল একেবারে তার কোলের উপর। আশ্চর্য! রমা দিব্যি দেখতে পেল সেটিকে মুঠিতে চেপে নিল কন্যা। মনের মধ্যে ওর খেলে গেল দারুণ হাওয়া! রিক্সাটি এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

চব্বিশটি ঘণ্টা এরপর কিভাবে যে পার হয়েছে! কোনভাবেই ভাষায় বোঝানো যায় না। এই কী অনুভব! আনন্দ খুশি, রোমাঞ্চ– সব মিলে এক অদ্ভুত অনুভূতি। রাজকন্যা ওর চিরকুটটি নিয়েছে! এর উত্তর কী পাবে সে তার কাছ থেকে? কবে, কখন ফিরিয়ে দেবে কন্যা তার ব্যাকুল মনের প্রত্যুত্তর। ঠিক ঠিক ঐ কথাগুলোই কি জানাবে না সে ওকে? বলবে না, আমি তোমাকে ভালবাসি!

পড়ালেখায় মন নেই। খাতা-বই হাতে প্রাইভেট টিচারের বাড়িতে না গিয়ে খোলা মাঠ দিয়েই হেঁটে বেড়ায় সে। বন্ধুদের আড্ডায় বেভুলে গিয়ে বসে। মনের গতিকটা যে নিতান্তই নাজুক, অনুমান করতে পারে– এমন আছে কেউ-কেউ। রমাকান্তর করুণ ভাবটি নিয়ে ছড়াও কাটে তারা। মজেছে আমাদের রমা, বালিকার প্রেমে মজেছে! সন্ধ্যার ঠিক আগে-আগে ঠিক সে বাড়ির সামনের সেই রাস্তাটি দিয়েই হাঁটতে থাকে। একবাঁক ঘুরে আবারও সেই দিকে। মেয়েটির ততক্ষণে ঘরে যাবার সময় হয়। মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করে রমা। কিছু একটা বলতেই হবে তাকে। ঐ বুঝি মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে! মরিয়া হয়ে বলে সে– কথা চাই কথা, কিছু তো বল কন্যা!

রাস্তার সবক'টি বাতি একসাথে জ্বলে ওঠে তখন। রাজকন্যার বাড়ির বারান্দারটিও। বারান্দাতে তখন আর কাউকেই দেখা যায় না। রমাকান্ত পায়ে পায়ে বাড়ির পথেই এগিয়ে যায়।

পরদিন সকালটা যে স্মরণীয় এক সকাল হতে পারে– জানত কী রমা? সন্ধ্যার বাতি জ্বলে ওঠার সাথে সাথে অপসৃয়মান কন্যার অবয়বের মতই যে মনের বল সব লুপ্ত হয়েছিল, সকাল বেলার নতুন আলোয় মনে হঠাৎই আবার একটু আভা ফুটে ওঠে। দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে সত্যিই যখন সে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, তার দিকেই এসে পড়ে এক চিরকুট। হাতের মুঠোয় চেপে নেয় সে। উঠে বসে এক রিক্সায়। চোখের সামনে মেলে ধরে কাগজটি। দীর্ঘ দম নেয় রমা। টেনে নেয় যেন জীবনের আস্বাদ। তিনটি

স্কুল ফাইনাল শেষে রাতের খাবারের পর বেরিয়ে পড়ে রমা। বসন্তের হাওয়ায় দেয় দোল। নদীর পাড়ে মন্দিরসংলগ্ন বাড়ির অবরুদ্ধ রাজকন্যের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়, বেরিয়ে এসো কন্যা! মনের মধ্যে বিড়বিড় করে। একটা যে যুতসই শব্দ খুঁজে পেয়েছে তাই ধরেই ডেকে ওঠে, 'দোলদোলা!' অপেক্ষায় অপেক্ষায় বাড়ির আলো সব ক্ষীণ হয়ে হয়ে মিলিয়ে যায়। রাস্তার বাতিগুলোও ম্লান হয়ে আসে। রাজকন্যার ছায়া এসে পড়ে বারান্দায়।

শব্দে হৃদয়ের কথাটি রাজকন্যা আজ জানিয়েছে তাকে, আমি তোমাকে ভালবাসি!

ভেসে বেড়ায় রমাকান্ত। ভালবাসার কেতন ওড়ায় হাওয়ায়। সময়গুলো কিভাবে পার হয় যে তার! শরৎ পেরিয়ে গিয়ে শীত আসে। আসে বসন্ত।

পরিচয়ের স্তর কতকও পার হয় তারপর। স্কুল ফাইনাল শেষে রাতের খাবারের পর বেরিয়ে পড়ে রমা। বসন্তের হাওয়ায় দেয় দোল। নদীর পাড়ে মন্দিরসংলগ্ন বাড়ির অবরুদ্ধ রাজকন্যের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়, বেরিয়ে এসো কন্যা! মনের মধ্যে বিড়বিড় করে। একটা যে যুতসই শব্দ খুঁজে পেয়েছে তাই ধরেই ডেকে ওঠে, 'দোলদোলা!' অপেক্ষায় অপেক্ষায় বাড়ির আলো সব ক্ষীণ হয়ে হয়ে মিলিয়ে যায়। রাস্তার বাতিগুলোও ম্লান হয়ে আসে। রাজকন্যার ছায়া এসে পড়ে বারান্দায়। প্রাচীর সংলগ্ন পাইপ বেয়ে সেখানে গিয়ে ওঠে রমাকান্ত।

রাতের পর রাত এভাবে কোটালপুত্র মেলে রাজকন্যার সাথে। বাড়ির সবক'টি আলো নিভে গেলে অপেক্ষায় থাকে কন্যা, কখন কণ্ঠটি শোনা যায়! অধীর প্রতীক্ষায় কাটে সময়। আহারে বিহারে মন নেই, পাসের পড়া উঠেছে সিকেয়। বই একখানা খুলে রেখে তাকিয়ে থাকে দূরে। সেখানে শুধুই রাজপুত্রের অপেক্ষা। কোটালপুত্র একেবারেই রাজপুত্রটি হয়ে উঠেছে তার জন্মজন্মান্তরের। এত ভালবাসাও থাকে মনে! এই কী অনুভব! এই কী অভূতপূর্ব মনের গতিক তার– বুঝে পায় না। রমাকান্ত নাম তার। মুখে-চেহারায় কেমন শান্ত, অথচ সারাক্ষণই বকে চলেছে তার সামনে। উৎসমুখ থেকে কেবলই যেন বেরিয়ে আসছে ধারা। সে যা বলে অনর্গল, ঠিক ঠিক তার উত্তর তো খুঁজে পায় না কন্যা। তবু সে বলে যায়। আবার দুটো কথা শোনার জন্যও কেমন অধীর থাকে। ভালবাসি ভালবাসি! কবে তারা হবে একসাথে? জীবন কবে শুরু হবে একসাথে? মনে হয় হঠাৎই কেমন পরিণত হয়ে ওঠে ওরা। ভালবাসায় বিভোর হয়। কন্যার হাতটি বাঁধা থাকে রমাকান্তর বুকের উপর।

কখনও ছেড়ে যাবে না তো? প্রশ্ন করে সে।

মাথা নাড়ে কন্যা, কক্ষনোও না।

ভুলে যাবে না-তো? চলে যাবে না তো দূরে কোথাও?

কক্ষনো না, কোনদিনও...।

বুকের মধ্যে তার হাত চেপে ধরে রাজকন্যার। রাতের পর রাত ভোর হয় ওদের বারান্দায় পড়ে থাকা একটুকু চৌকিতে। সময় পেরিয়ে যায়। মধ্যরাতের নিঃস্তব্ধ প্রহর দ্রুত বয়ে চলে। কোথাও দু'একটা প্রহরী চতুষ্পদের ডাক শোনা যায়। ঝিঁঝি পোকার একটানা সুরও ভেসে আসে খানিক। খুব দূরে নয় গীর্জা থেকেও ভেসে আসে ঘণ্টার ধ্বনি। একে একে সবগুলো ঘণ্টা বেজে যায়। জানিয়ে দেয় যে রাত হচ্ছে ভোর। কাছে-দূরে মসজিদের আযান শোনা যায়। কাছেই বাড়ির পোষা মোরগের কক্কক ধ্বনি। তার সাথেই গেয়ে ওঠে গাছের ডালে ঘুম ভাঙা কোন পাখি।

রমাকান্তর তখন ঘরে ফেরার পালা। খানিকটা আরো কিছু সময় তবু বসে থাকে সে। মন চায় না। রাত পোহাবার কাল দেখে ওরা একসাথে এভাবে যেন কতকাল! কুয়াশার আবছা পর্দাটা সরতেই বিদায় নিতে হয়। প্রেমিকার হাতে দিনের চুম্বনটি এঁকে দিয়ে পথে নামে সে।

ঠিক কত রাত এইভাবে মিলেছে ওরা কে জানে। নিজেও সে পায় না তার কিনার। নিশাচর যাত্রীর মত রাতের খাবার শেষে– বাড়ির সকলে গিয়েছে যখন বিছানায়, চাঙা হয়ে উঠেছে তখনই। শরীর-মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে তার। ঘরের সবক'টি বাতি নিভে গেলে শোবার ঘরের দরজা আস্তে ভেজিয়ে রেখে গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে গেছে সে।

দুনিয়ায় কোনকিছু যে নিত্য নয়, তাই বুঝি রাহুর গ্রাসই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। রমাকান্তর সেই রাত ভোর যে হয় কখন, হঠাৎই এক তন্দ্রা লাগা ঘোরের মধ্যে ঠাওর হয় না। ঘোর যখন ভাঙে রাজকন্যার পাশ থেকে উঠে পড়ে সে। আর ঠিক তখনই ঠিকা কাজের মেয়েটি দেখে ফেলে! দেয়াল বেয়ে কোনরকমে পথে নামে রমা।

এরপর থেকেই রাজকন্যাকে আর দেখা যায় না। কত রাতে গিয়েও আর পায়নি রমা। স্কুলের পথেও না। একদিন বিকেল বেলায় আবছা আলোয় কেবল ঠাওর হয়েছিল, কেমন ফোলা ফোলা চোখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কন্যা! খানিক বাদেই আবার মিলিয়ে গেছে। ততদিনে বাড়িতেও খবর এসেছে রমার।

ও বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন দেখা যায় না তাকে! লজ্জা করে না, কোটালপুত্র হয়ে রাজকন্যার দিকে নজর করে? কথাগুলো যেন মনে থাকে! শাসিয়ে যান কন্যার পিতা। কী যোগ্যতা আছে তার? অমন মেয়ের দিকে লোভ! একেকটা কথা যেন শেলের মত গিয়ে বেঁধে বুকের মধ্যে! কী যোগ্যতা আছে তার? তাই তো। স্কুলের পথেও আর দেখা যায় না কন্যাকে।

পৃথিবীর আলো-হাওয়া সব অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বেঁচে থাকা নিদারুণ কষ্টের হয়ে ওঠে। উন্মত্তের অবস্থা তখন রমার। ছেলের দিকে তাকাতে পারেন না মা। স্বামীর কথার উপরে কথা বলার সাহসও নেই তাঁর। ছেলে যে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে– তবু বাপের খেয়াল নেই! একটি কথাও বলেন না সন্তানের সাথে। অন্য বাড়ির লোক এসে অত কথা শুনিয়ে গেল যার জন্যে তার দিকে আবার কিসের দরদ! এ রকমই মনোভাব পিতার। সহোদরের দিকে তাকিয়ে মনটা কেঁদে ওঠে দাদার। ভাইটিকে আগলে ধরেন তিনি। ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরিয়ে আনেন তার। ঠিকই তো, যোগ্য হতে হবে রমার। এক্কেবারে যোগ্য মানুষটি হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সামনে।

কিন্তু হল কি ওর? সেদিন অমন ফোলা ফোলা চোখে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে! মুহূর্তের জন্যেও ভাবনাটা তো নামাতে পারে না মাথা থেকে। কী হয়েছিল তারপর? বাপ বকেছিল খুব? খুব কেঁদেছিল ও? কেন অমন দেখাল ওকে? দরকার নেই আর ওখানে যাবার। ও ভাল থাক শুধু। বাপ-মায়ের আদরে থাকুক। একদিন তো ওকে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে সামনে। ততগুলো দিন শুধু একটু ভাল থাকুক রাজকন্যে!

আর্ট কলেজে গিয়ে ভর্তি হয় রমাকান্ত। টাকা-পয়সা যে বড় যোগ্যতা সমাজে– কে না জানে! কিন্তু জীবনটা তো নিজের মত করেই গড়তে চায় সে। বাড়িতে শুধুমাত্র দাদার সায়। চিত্রকলার দিকে টান যে ভাইটির শৈশবের– জানেন তিনি। আর সকলে যা বলেন তাতে তো রমার চলে না। মনের সাথে জোর চলে না মানুষের।

মনে হয় হঠাৎই কেমন প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে রমাকান্ত। আগের থেকে পরিণত। দুনিয়ায় কোন বাধাই আর আটকাতে পারবে না তাকে। মনের পূর্ণতা ঘটাবে ও জীবন দিয়েই।

ক্যাম্পাসের সুনিবিড় ছায়াতলে বসে একেক সময় কত কথা মনে আসে। বারান্দার একখণ্ড চৌকিতে দু'জনের নিশিযাপনের কথা মনে পড়ে। রাজকন্যার মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই আবার সেই অভদ্র মানুষটা সামনে এসে দাঁড়ায়। তীর্যক বানের মত গেঁথে যে গিয়েছিলে মনের মধ্যে, তার একটা খচখচানি তো আছেই। নিজের মধ্যে অনেক

রাজকন্যার হাতটি মুহূর্তে মুঠোয় চেপে ধরে বেরিয়ে আসে রমাকান্ত। সামনেই তখন গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে! গর্জে ওঠেন তিনি। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়েন একেবারে। একহাতে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে, স্ত্রী এসে হাত চেপে ধরেন তার। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন তাকে। রমাকান্তর উদ্দেশে এমন সব বাক্য উচ্চারণ করেন যে, এক মুহূর্তও আর থাকা সম্ভব হয় না তার। চিৎকার করে ওঠে কন্যা। তীব্র আর্তচিৎকারের মুখে ঘরের দরজায় তালা পড়ে তার।

কথার মীমাংসাও করে সে। অবাকও হয়, সেদিন কী করে অমন করতে পেরেছে? বাড়িঘর মানুষজন, সময়-অসময় কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে কী করে অমন ছুটে গেছে তার কাছে? ছেলেবেলা থেকেই শান্ত ছেলে বলে সবাই যাকে চেনে, অতখানি ডেসপারেট কী করে হয়েছিল সে? আশ্চর্য হয় সেসব ভেবে একেক সময়। বাড়ি থেকে কষে টেনে না ধরলে এ পর্যন্ত আসা হত না। ভদ্রলোককে মনে মনে ক্ষমাই করে সে। মনের জোর বাড়িয়ে তুলতে চায়। শিল্পের সাধনায় জীবন কাটাতে পণ করে রমাকান্ত। জগতের যা অকৃত্রিম সুন্দর– জীবনভর কেবল তারই সাধনা করবে সে। টাকা-কড়ি সম্পদে লোভ নেই তার। কিন্তু রাজকন্যা? কেবল ঐ একটি জায়গায়ই বড় অসহায় সে। সহপাঠী বিপরীত লিঙ্গেও আগ্রহ নেই। মনের মধ্যে কেবলই যক্ষপুরবাসিনী। কোমল মায়াবী সে মুখখানি পূর্ণ নারী হয়ে সত্তার গভীরে তোলপাড় তোলে। বেঁচে থাকতে আজ যে তাকেই বড় প্রয়োজন ছিল তার!

যোগ্য হও রমাকান্ত! অমন কন্যার যোগ্য হয়ে তবে সামনে গিয়ে দাঁড়াও। যে যোগ্যতার ইঙ্গিত সেদিন তার পিতা করেছিলেন সে আর যাই হোক শিল্পের দিকে নয়। ধন-সম্পদ, টাকা-কড়িতে যোগ্য হও। ব্যবসায়ী পিতার মনে এছাড়া আর কি থাকতে পারে? কন্যা একবার জানিয়েছে কাছের মানুষকে দিয়ে– রাজপুত্র যেন একটিবার এসে নিয়ে যায় তাকে! পিত্রালয় তার কাছে গারদ সমান! সাহস করেনি রমাকান্ত। শিল্পের সরল কঠিন পথে আর যা হোক রাজকন্যার মর্যাদা হবে না। তার চেয়ে ভাল দেরি করে হলেও সুদিনের অপেক্ষা। জীবনটাকে পূর্ণভাবে পেতে সময়ের কাজকে উপেক্ষা করা যায় না, কোন মনীষীর কথা। পূর্ণতার লোভ নেই তার। বাস্তবের ঘাত মোকাবিলার আন্দাজ যে কিছু হয়েছে, রাজকন্যার ভার তুলে নিতে জোর তাই পায় সে কোত্থেকে? সময় চাই সময়। আরেকটুখানি সময়। কীর্তি দিয়ে সুনাম আদায় করে নেবে সে। মানুষ প্রশংসা করবে। তখনও কি ভরবে না তাঁদের মন? স্ত্রীর খরচ বইবার সাধ্য ততদিনে হয়তো হয়েও যাবে। জীবনের চাওয়াগুলো মিটবে নিশ্চয়ই।

যক্ষপুরীতে রাজকন্যার দিন যে কাটছিল কিভাবে– যদি জানত তা কোটালপুত্র! নিরতিশয় প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখতেই বুঝি জীবন! যা হয় আর কি, অর্থভারে উন্মত্ত পিতা একেবারে খড়গহস্ত। পড়াশুনো সব সিকেয় উঠেছে। দরকারই-বা কি তার? এমনই মত। পাশের পরীক্ষাটা দিতেই কেবল ছেড়েছিলেন মেয়েকে যেন সৈন্য-সামন্তসহ। ফলাফলের তাড়া নেই। বাড়ির বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়াবার অনুমতি নেই কন্যার। ঘর আর অন্দরের জায়গাটুকু তার ক্ষেত্র। মেয়ের দশা দেখে মায়ের মনে কেবল হাহাকার। এই কী পাষাণ মানুষ! আপন শিশুটিকে কি-না শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে এমন করে! অমন স্বামীর সাথে বাক্যালাপেও অরুচি হয় তার। প্রথম দিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কত– মেয়েটাকে একটু তো এদিক ওদিক ঘুরতে দাও! রাজি হননি। পায়ে ধরতে কেবল বাকি রেখেছেন তার। জোড় হাতের মিনতি রাখেন না যে পুরুষ ধিক্ তাকে! স্বামী তার মনের নাগাল কোনদিনও আর পাবেন না– বুঝে নিয়েছেন তিনি। স্বজন মুখে কতভাবে একবার খবর পাঠিয়েছেন, পুত্র যেন একটিবার এসে দেখা করে তার সাথে। জানেন তিনি, সে যে পড়াশুনো করছে অন্য শহরে এবং মনটা তার এখনও যক্ষপুরীর কন্যার কাছে বাঁধা।

একদিন তারপর পায়ে পায়ে মন্দিরের গায়ে গিয়ে দাঁড়ায় রমাকান্ত, সন্ধ্যার পর। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষে বাড়িতে ফিরেছে সে আগের রাতে। মন্দিরে তখন ধূপের আরতি। ঘণ্টার ধ্বনিও শোনা যায়। কাউকেই কিছু না জানিয়ে এসেছে সে। মনের মধ্যে স্থির ছিল– দেখা হবেই।

মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যখন, পুজোর ঘণ্টাও গেছে থেমে। শেষ হয়েছে পুজো। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছেন মাতা, হাতে প্রসাদের থালা। মনে হয় যেন আগে থেকেই জানতেন তিনি– পুত্র আজ সামনে এসে দাঁড়াবে। রমাকে দেখে স্মিত একটা হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে রমা। কী করে বুঝেও গেছে, এ নিশ্চয়ই যক্ষপুরবাসিনীর মাতা। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন তিনি। প্রসাদের থালাটি এগিয়ে ধরেন, বড় ভাগ্যের বাবা শুভ তিথিতে এই প্রসাদ পাওয়া, নাও। রমার মন ভরে যায়– এই কি আশীর্বচন করছেন মাতা আজ তাকে! গ্রহের কী শুভক্ষণ আজ! পায়ে পায়ে মায়ের সাথে এগিয়ে চলে রমাকান্ত। কত কথা জেনে নেন তিনি। মেয়ের কথাও পাড়েন। মনের মধ্যে তখন তার কত কথার আকুলি-বিকুলি। তবু নিজে থেকে একটি কথাও বলতে পারে না, একটি কথাও জানতে চায় না কন্যার। বুকের মধ্যে তার কেমন তোলপাড়! একেকটি কথা মায়ের কানে যায়, আর হু হু করে বুক। আহা আজ কি একটিবার দেখা হবে তার সাথে! কী বলবে সে? কত কথা জমে আছে, সব কী বলে উঠতে পারবে? চোখে চোখ রাখতে পারবে? হাতে হাত? আর... আর কী? আদরে বুকের মধ্যে কি চেপে ধরতে পারবে একটিবার?

বাড়ির একেবারে অন্দর দরজায় যখন এসে পড়েছে, রাজকন্যা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। মায়ের দিকে চোখ যায় তার– মুখে অমলিন হাসি। আশ্চর্য মাকে তার কতদিন পর এ রকম দেখাচ্ছে। কী এমন ঘটেছে মন্দিরে যে মনটা এত প্রফুল্ল? ভাবতেই পিছনের মানুষটি সামনে এসে দাঁড়ায়। এ কাকে দেখছে পুরবাসিনী? এ কাকে দেখছে রমাকান্ত? এই কী রূপ তার সামনে রাজকন্যের!

অন্তপুরবাসিনী না জানি কত কষ্ট সয়ে সয়ে এইরকম হয়ে উঠেছে! আহা, ওর মনের তল কী আর খুঁজে পাবে সে? নিজেকে কী বলে তার সামনে দাঁড় করায় সে? রমা যখন এই রকম ভাবছে, রাজকন্যা কোনভাবেই নিজেকে সামলাতে পারে না। বুকের জমাট কান্না গলে গলে নামে তার। মুখে কোন কথা জোগায় না। কাছে গিয়ে রমা দু'হাতে চেপে ধরে তাকে। স্থির চোখে একবার তাকায় সে। পরক্ষণেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দিকে যায়। রমা অনুসরণ করে তাকে। বিছানায় মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে কন্যা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রমা খানিক থম মেরে থাকে। হঠাৎই তারপর দু'হাতে টেনে বুকে চেপে ধরে কন্যাকে। খানিকক্ষণ কাটে। কাজের মেয়েটি এসে জানায়, গৃহকর্তা যে বাড়িতে এসেছেন। রাজকন্যার হাতটি মুহূর্তে মুঠোয় চেপে ধরে বেরিয়ে আসে রমাকান্ত। সামনেই তখন গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে! গর্জে ওঠেন তিনি। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়েন একেবারে। একহাতে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে, স্ত্রী এসে হাত চেপে ধরেন তার। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন তাকে। রমাকান্তর উদ্দেশে এমন সব বাক্য উচ্চারণ করেন যে, এক মুহূর্তও আর থাকা সম্ভব হয় না তার। চিৎকার করে ওঠে কন্যা। তীব্র আর্তচিৎকারের মুখে ঘরের দরজায় তালা পড়ে তার।

সেই শেষ! তারপর আর দেখা হয়নি!

রমাকান্ত আজ শিল্পী। দেশ ছাপিয়েও তার পরিচিতি। সচ্ছলতাও এসেছে। কেবল রাজকন্যার বাড়ির দরজাটিই আছে আঁটা। একটি বড় তালাও ঝুলছে সেখানে। শোনা যায়, শেষ দেখার সেই রাতেই পিতা তার কন্যার ঘরটিতে তালা এঁটে দিয়েছিলেন। স্বগোত্রীয় বন্ধুর ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করেছিলেন। ইচ্ছেটা তার পূরণ হয়নি। বাইরে থেকে তালাটি তিনি খুলেছিলেন যখন, কন্যা তার অনেক আগেই জীবনের সব তালা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন!

তৃপ্তি বালা ছোটগল্পকার, চিকিৎসক

ভ্রমণ

শিলং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রভবন দর্শন

তপন চক্রবর্তী

শিলং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী। ইউরোপীয় শাসকেরা একে প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড বলতেন। পাশ্চাত্যের স্কটল্যান্ড দেখার সুযোগ আমার হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা ছিল কিন্তু "দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া"। শিলং ভ্রমণের অপর একটি বড় কারণ, শিলংয়ে বিশ্বকবির বাসভবন চাক্ষুষ করা। যে ভবনে বসে কবি তাঁর অমর উপন্যাস *শেষের কবিতা* ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক *রক্তকরবী* লিখেছিলেন। কৌতূহল ছিল, রবীন্দ্রনাথ কেন বার বার শিলং যেতেন। তিনি ১৯১৯, ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে শিলং গিয়েছিলেন। তখন কলকাতা থেকে শিলং পর্যন্ত কোন বড় সড়ক ছিল না। সড়ক যেটুকু ছিল তা দিয়ে উন্নতমানের কোন যন্ত্রযান চলত না। ভারতীয় রেলওয়ে সে-সময় আসামের বর্তমান রাজধানী গৌহাটি পর্যন্ত রেল লাইনেরও সম্প্রসারণ ঘটায়নি। কবি সম্ভবত ব্রহ্মপুত্র নদ বেয়ে স্টীমারে গৌহাটি যেতেন। গৌহাটি থেকে দুর্গম পথে একশো কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে শিলং যেতে হত। অষ্টাদশ শতকে গরুর গাড়ি, পরে ঘোড়ার গাড়ি এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে অ্যালবিয়ন নামের যন্ত্রচালিত গাড়ি গৌহাটি থেকে শিলং যেত।

নানা কারণে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। জীবনের পড়ন্ত বেলায় ক'জন তরুণ তুর্কী শ্যামলী পরিবহনের ব্যবস্থাপনায় শিলং যাচ্ছে শুনে আমিও যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করি। তাঁরা আমার বয়স ও দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেও সম্মত হন। শ্যামলী পরিবহন পাসপোর্টে মেঘালয়ের ডওকি সীমান্তের ভিসার ব্যবস্থা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরিবহনে আমাদের ঠাঁই হয়নি। আমরা আলাদা ব্যবস্থাপনায় তামাবিল হয়ে ডওকি পৌঁছি। সিলেট পর্যন্ত রাস্তা বোধ করি খুব খারাপ ছিল না। থাকলেও রাতে ঘুমঘোরে টের পাইনি।

কিন্তু সিলেট থেকে তামাবিল যাওয়ার রাস্তা এত জঘন্য যে তা বর্ণনাতীত। এমনিতে বাংলাদেশের প্রান্তিক রাস্তাগুলোর অধিকাংশেরই অবস্থা খারাপ। উন্নতমানের পাজারো জিপেও মনে হচ্ছিল দেহের হাড়গুলো আস্ত নিয়ে বোধ করি শিলং যাওয়া হবে না। সেতু ও যোগাযোগ মন্ত্রী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূরণ করে উঠতে পারেন না। ঈদ-পূজা পর্ব বাদ দিলাম– তখন তো 'হরিবোল' (Horrible) অবস্থা। অন্যান্য সময়েও দেশের যানবাহনের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। গলিগুঁজি বাদ দিয়ে অন্তত সড়কগুলো মসৃণ ও সুন্দর থাকলে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া যেত।

বাংলাদেশে প্রায় সপ্তাহখানেকের ছুটি থাকায় প্রায় চার/পাঁচ শতাধিক ভ্রমণপিয়াসী সীমান্তে জড় হয়েছিলেন। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি নেমেছিল। তামাবিল বা ডওকিতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোন অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া প্রায় সকল সীমান্তে বহির্গমন ও শুল্ক বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের 'বায়না' মেটানো ছাড়া পাসপোর্ট বের করে আনা বেশ দুঃসাধ্য। কাজেই ঝাড়া দুই ঘণ্টারও বেশি বৃষ্টিতে ভিজে তামাবিল পার হয়ে ডওকিতে আসি। সেখানকার অব্যবস্থা আরও ভীতিকর। মাত্র দু'জন কর্তা তাল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। মনে হল ওঁরা এই কাজে নতুন ও অনভিজ্ঞ। তবে, ভাগ্যিস, ওঁরা 'ফেল কড়ি মাখো তেলে' রপ্ত হয়ে ওঠেননি। আরো সৌভাগ্য, তখন বরুণ দেবতা সদয় হয়ে বর্ষণ বন্ধ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিমান বন্দর ছাড়া অন্য সকল সীমান্তে সরাসরি বা নানা ছুতানাতায় পকেট কাটতে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস হাতপাকা করে ফেলেছে। অধিকাংশ যাত্রী তো সীমান্তে অনুসৃত আইন জানেন না। তাঁরা না জানার এই সুযোগটাই নেন। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার মুদির দোকানে দ্রব্যের দাম টাঙানোর ব্যবস্থা করেছেন। দ্রব্যের গায়ে মূল্য উল্লেখের আইন আছে। কিন্তু সীমান্তে বিধিসমূহ বড় করে লিখে টানানোর ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে দুই দেশের সরকারের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, সীমান্তে কি আমাদের গোয়েন্দা নেই? ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস-এ অনৈতিক কারবার কি তাঁরা দেখতে পান না? নাকি সর্ষের মধ্যে ভূত!

দ্বিতীয়ত, বেনাপোল বা ঢাকা বিমান বন্দরে শুল্ক বিভাগে পাসপোর্ট দেখাতে হয় বটে, এর কোন রেকর্ড রাখার বা যাত্রীর স্বাক্ষর নিয়ে পাসপোর্ট ছাড়ার কোন নিয়ম নেই। এই ব্যাপারটি ভারতের ডওকি সীমান্তেও লক্ষ করি। এক দেশে দুই সীমান্তে দুই নিয়ম থাকার কারণ বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশের লোকেরা এখনও সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়ানোর অভ্যাস রপ্ত করেনি। সেই মানসিকতাও গড়ে ওঠেনি। ফলে কাকে ল্যাঙ মেরে কার আগে পাসপোর্ট বের করতে পারে তার জন্য দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। এতে অফিসারেরাও দিশা হারিয়ে ফেলেন। পাসপোর্টের সিরিয়াল ঠিক রাখা তাঁদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে আমাদের পাসপোর্ট উদ্ধার হতে বিকেল প্রায় পাঁচটা।

গোদের উপর বিষফোঁড়া, ডওকি থেকে শিলং যাওয়ার কার ভাড়া যেখানে দুই থেকে আড়াই হাজার রুপি, সেখানে সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে ভাড়া ৬-৭ হাজারে দাঁড়ায়। যাঁরা এখানকার ব্যাপার-স্যাপার জানেন, বা ভ্রমণে অভ্যস্ত, তাঁরা আগেই গাড়ি ও শিলংয়ে হোটেল বুক করে রওনা দিয়েছিলেন। আমরা আনাড়ির দলে। আমাদের কোনটিই করা ছিল না। তদুপরি শেষ বেলায় কেউ যেতেও রাজি হচ্ছিলেন না। পাহাড়ি ১০০ কিলোমিটারের পথ। রাতের অন্ধকারে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

আমরা প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ডওকি বাজারে গিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে স্থির করে এক ট্যাক্সিওয়ালাকে দ্বিগুণ ভাড়ায় ডওকি পৌঁছতে রাজি করাই এবং মালসমেত উঠে পড়ি। ডওকিতে নেমে হোটেল বা গেস্ট হাউজের খোঁজ করি। সেখানেও ঠাঁই নেই। শেষাবধি এক হোটেলের গর্ভগৃহে ঠাঁই মিলে চারজনের। অন্যজন মাদুর বিছিয়ে ফ্লোরে। ভাড়া স্বাভাবিক সময়ের তিন গুণ। তবু ভাল রাতটা রাস্তায় কাটাতে হবে না!

শিলং এর নৈসর্গিক দৃশ্য

চেরাপুঞ্জির নহকালিকাই জলপ্রপাত

সেভেন সিস্টার জলপ্রপাত

বর্ষায় চেরাপুঞ্জি পাহাড়

চেরাপুঞ্জির ভূদৃশ্য

ডওকি নদীতে নৌকাভ্রমণ

কামাখ্যা মন্দির

গৌহাটির বালাজি মন্দির

এরপর আমাদের জন্য আরেক বড় সমস্যা অপেক্ষা করছিল। এখানে কোন মানি চেঞ্জার নেই। তামাবিলেও ছিল না। বাংলা টাকা তো এঁরা নেবেন না। খাব কি? হোটেলের ভাড়া মেটাব কী করে? যাহোক, খবর পাওয়া গেল এক মহিলা বাংলা টাকার বদলে রুপি দেন। তাঁর দ্বারস্থ হলে তিনি যে দরে দিলেন তা প্রচলিত দরের চেয়ে অনেক কম। অবশ্য পরে খোদ শিলংয়ে সরকার অনুমোদিত মানি চেঞ্জার মহিলার চেয়েও কম দেন। যাহোক, এখনকার মত মুশকিল-আসান তো হল!

ডওকিতে একটিই বাঙালি হোটেল। দাস হোটেল। একটা হোটেল হলে যা হয়! যা দাম হাঁকবে তাই দিতে হবে! রান্নাটা ভাল হলে তবু পুষিয়ে যেত। রান্না ভাল করার তো ওদের কোন দায় নেই! যা রাঁধবে তাই গিলতে হবে। পকেটের দিকে না তাকিয়ে নাক-মুখে দুটো গুঁজে ক্লান্ত দেহখানিকে বিছানায় সঁপে দিই। আমার তো জীর্ণ তরী। অশ্বমেধের ঘোড়া ডাক্তার গৌতম, অধ্যাপক সুব্রত, শেখর কবরেজ ও সমাজসেবী গণেশ কাকু-জ্যেঠুরা যেন আমার চেয়েও ক্লান্ত বিধ্বস্ত।

পরদিন সকালে চেরাপুঞ্জি হয়ে শিলং শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। ডওকি সেতু পার হয়ে চেরাপুঞ্জির পথে যাত্রা শুরুতে গত দিন ও রাতের সকল ধকল, কষ্ট ও বিড়ম্বনা এক মুহূর্তে উবে যায়। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে পাহাড়ের পরে পাহাড়, তাতে জমে থাকা মেঘের পরে মেঘ, আর শ্যামলী নিসর্গের অফুরন্ত ভাণ্ডার। প্রকৃতির এই অপার অকৃত্রিম দান গ্রহণের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক তা সবার থাকে না। আমারও ছিল না। হঠাৎ যক্ষের ধন পেলে সাধারণ মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, আমার অবস্থার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাই। আমি মুগ্ধ চোখে পাতা না ফেলে কেবল চেয়েই থাকি। অবিরাম একই দৃশ্যে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার দৃশ্য মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যায়। নিসর্গের প্রেক্ষাপটে অদৃশ্য কুশীলবেরা যেন নীরবে নব নব সাজে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে চলে।

শিলং-কন্যা প্রখ্যাত সমাজকর্মী ও কবি অঞ্জলি লাহিড়ীর 'অনন্ত যাত্রী আমি' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘালয়' কবিতায় মেঘালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

মেঘালয়ের আকাশ জুড়ে
নীলাম্বরী মেঘ
কোথা থেকে পায় সে ছাড়া সে
কোথায় ছুটে যায়
কেউ কি জানে ঠিকানা তার
কেউ কি জানে হায়!
হঠাৎ নামে বৃষ্টিধারা
আকাশ ভেঙে পড়ে
তুলোর মত নীল কুয়াশা
সৃষ্টি আঁধার করে।
পাহাড় থেকে ঝর্না নামে
শব্দে উতরোল
তরতরিয়ে পথ কেটে যায়
তরঙ্গ হিল্লোল।...

চেরাপুঞ্জির প্রায় শীর্ষদেশের এক পাহাড় থেকে জলপ্রপাতটি দেখা যায়। শুখা মৌসুমে পাহাড় থেকে সিঁড়ি বেয়ে অনেক নিচে নেমে জলপ্রপাতের কাছেও যাওয়া যায়। শীর্ষদেশে বেশ ক'টি দোকান ও রেস্তোরাঁ রয়েছে। এখানে আস্ত দারুচিনি গাছের ডাল ও কাণ্ড কিনতে পাওয়া যায়। চেরাপুঞ্জির ঐতিহাসিক নাম সোহরা। রাস্তার মাইল স্টোনে এখনও সেই নাম ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি পূর্ব খাসি জেলার এক শহর।

চেরাপুঞ্জির তাপমাত্রা ১১.৫-২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় বলে চেরাপুঞ্জি পৃথিবী বিখ্যাত। বছরে গড়ে প্রায় ৯৩০০ সেন্টিমিটার বা ৩৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। গিনেস বুকের রেকর্ডে ১৮৬০-১৮৬১-এর আগস্ট-জুলাইয়ে এখানে ২৬,৪৭১ সেন্টিমিটার বা ১০৪২.২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। চেরাপুঞ্জি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর সেভেন সিস্টারস্ বা সাত বোন জলপ্রপাতও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবে বর্ষাকালে এর পাহাড়ের দৃশ্যপট বদলে যায়। সহস্রধারায় জল

নামতে থাকে। এই জল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মেঘালয়ের উমইয়াম ও উমঙ্গট নামের দুটি প্রধান নদী।

অবশ্য ঘোর বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ঝর্না নামে। পর্যটকেরা সাধারণত বর্ষায় চেরাপুঞ্জি যায় না। চেরাপুঞ্জির সসিনর‍্যাম গ্রামেই সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি পড়ে।

আমরা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গিয়েছিলাম। তখন প্রখর রৌদ্রতাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। চেরাপুঞ্জিতে এই সময়টায় কালেভদ্রে বৃষ্টি হয়। তবে বৃষ্টি যে-কোন সময় হুট করে নেমে আসতে পারে। এই অভিজ্ঞতা হয়েছে পরে। চেরাপুঞ্জির শীর্ষ থেকে নেমে আসার পথে একটি প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ আছে। পাহাড়ে খানিকটা উৎরাই বেয়ে উঠে সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়। আমি ঝুঁকি নিইনি। সাথীরা গিয়েছিল। প্রায় দুই কিলোমিটারের এই সুড়ঙ্গ নাকি রোমাঞ্চকর।

শিলং পৌঁছি বিকেল প্রায় পাঁচটায়। আমাদের গাড়ি পার্ক করা হয় শহরের কেন্দ্রে পুলিশ বাজারে। সুব্রত, শেখর, গণেশ হোটেল ও মানি চেঞ্জারের তালাশে বেরিয়ে পড়ে। আমি আর গৌতম গাড়িতে। গাড়ি থেকে বাঁয়ে ব্রাহ্ম হোমের একটি গেস্ট হাউস দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছিল যে হোটেল পাওয়া মুশকিল হবে। কারণ শহরময় পর্যটকে সয়লাব। হলও তাই। ওরা পঞ্চাশটি হোটেল দেখে হতাশ হয়ে এসে দুঃসংবাদ জানায়। আমি চট করে নেমে লাঠি হাতে ব্রাহ্ম গেস্ট হাউসে গিয়ে রিসেপশনের মহিলাকে রুম বরাদ্দের আবেদন জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি তাঁর হাতে আমার ভিজিটিং কার্ড দিই। তিনি এক পলক নজর বুলিয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে পাঠান। মিনিটের মধ্যে দীর্ঘদেহী, সুশ্রী ও সৌম্য চেহারার প্রবীণ এক ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আমায় অভয় দেন।

ভদ্রলোকের নাম শ্রী সুরজিত দত্ত। তিনি আমরা কয়জন জানতে চান। পাঁচজন শুনে তাঁকে চিন্তিত দেখাল। বললেন মহিলা আছেন কি না। নেই শুনে তিনি স্বস্তিবোধ করেন। তিনি ডরমিটরিতে খাটিয়া ঢোকানোর ব্যবস্থা করে বলেন যে, একজনকে ফ্লোরে মাদুরের উপর রাত কাটাতে হবে। কাল ওনার ব্যবস্থাও হবে। গাড়ি থেকে ব্যাগ নামিয়ে এনে ডরমিটরিতে রাখা হল। চার সিটের ডরমিটরিতে আট জনের ব্যবস্থা হল। তিন সিটে বাংলাদেশের তিন মুসলিম যুবক ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন সিলেট জালালাবাদ কলেজের নবীন অধ্যাপক।

ব্যাগ নিয়ে অন্যরা ডরমিটরিতে গেলে আমি সুরজিতবাবুকে বলি যে, আমি কেবল প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড দেখতে আসিনি। রবীন্দ্রনাথের বাসভবন দেখার খুব ইচ্ছা, যে ভবনে বসে তিনি তাঁর অমর সৃষ্টি রচনা করেছেন। তিনি আমাকে রিলবং যাবার পরামর্শ দেন।

চেরাপুঞ্জির পাহাড়ি সড়ক মসৃণ ও ছিমছাম দেখেছি। চেরাপুঞ্জি পেরিয়ে শিলং শহরে ঢুকি। শিলংয়ের রাস্তা যেন আয়নার মত স্বচ্ছ, ঝকঝকে পরিষ্কার। রাস্তায় এক টুকরো কাগজ, পলিথিন ব্যাগ নেই। মাঝে মাঝে শহরে থুথু ফেলারও নিষেধাজ্ঞা চোখে পড়ছে। সবচেয়ে বড় বিস্ময় রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে কার ছুটেছে। কেউ হর্ন বাজাচ্ছেন না। কেউ কাউকেই ওভারটেক বা আন্ডারটেক করছেন না। অ্যাম্বুলেন্স যেতে কর্ণভেদী বিকট আওয়াজ নেই। লাল পতাকা দেখে সবাই সরে গিয়ে এর পথ করে দিচ্ছেন। পুলিশের জলপাই রঙের পতাকা দেখেও একই আচরণ।

সন্ধ্যায় নৈশভোজের জন্য শহরে বেরোই। লোকজন ট্রাফিক পুলিশের অনুমতি ছাড়া রাস্তা পার হচ্ছেন না। মানুষ উচ্চৈঃস্বরে কথাও বলছেন না। মনে হচ্ছে কেউ প্রকৃতির নৈঃশব্দ্য ভাঙতে রাজি নন। শহর জুড়ে পরিকল্পিতভাবে পাইন, দেবদারু ও অন্যান্য গাছের সারি। শিলং শহরে স্থানীয় মানুষ থেকে পর্যটকের সংখ্যাই বেশি মনে হল। ভেজ, ননভেজ, বাঙালি, পাঞ্জাবি, দক্ষিণ ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

মেঘালয় উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট এক পাহাড়ি রাজ্য। খাসিয়া, জয়ন্তিকা ও গারো পাহাড় নিয়ে এই রাজ্য গঠিত হয়েছে। এর রাজধানী শিলং পূর্ব খাসি জেলার পাহাড়ে অবস্থিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪৯৬ মিটার উঁচুতে এবং এর উচ্চতম শৃঙ্গের নাম শিলং পিক। এর উচ্চতা ১৯৯৬ মিটার। ২০১১ সালের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী এর লোক

উমিয়াম লেক

প্রাকৃতিক গল্ফকোর্স

ক্যাথেড্রাল অফ মেরি হেল্প অফ ক্রিস্টানস্

জিংভূম

অ্যালবিওন মোটর

এলিফ্যান্ট ফলস্

সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৪ সালে এই শহরের পত্তন করে। তখন শিলং অবিভক্ত আসামের রাজধানী ছিল। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি মেঘালয়ের জন্ম। এ সময় থেকে গৌহাটি আসামের রাজধানীর মর্যাদা পায়।

শিলংয়েও বেশ বৃষ্টিপাত হয় তবে চেরাপুঞ্জির তুলনায় অনেক কম। আপমাত্রা উর্ধ্বে প্রায় ২৪ ডিগ্রি ও নিচে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৮৯৭ সালে এখানে রিখটার স্কেলের ৮.১ মাত্রায় ভূমিকম্প হয়। ফলে এতদঞ্চলের ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়। মেঘালয়ে শতকরা ৮৫ভাগ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। এখানে খাসি জনসংখ্যা বেশি। তারপর জয়ন্তিয়া ও গারো জনসংখ্যা। ভাষা মূলত খাসি ও ইংরেজি। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৫-এর উপরে। শতকরা ৯১জন মহিলা শিক্ষিত। শিলং শহরে খ্রিস্টান ৪৬%, হিন্দু ৪২%, মুসলিম ৫% এবং বাদবাকি বৌদ্ধ-জৈন সব মিলিয়ে। অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। এখানে এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলে ভাল। এখানকার কমলা খুব সুস্বাদু। এটিই চেরাপুঞ্জির প্রধান রপ্তানিযোগ্য ফসল।

২০১৮ সালের মে মাসের ৩ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারটার বাসে আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। শুক্রবার রাত ডওকিতে কাটিয়ে শনিবার সকালে চেরাপুঞ্জি। বিকেলে শিলং। পরদিন অর্থাৎ রবিবার ভোর ছ'টায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক কামাখ্যা-কামরূপ মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। ভোরের আগে সাফাই কর্মীরা রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছেন। শিলং থেকে গৌহাটির ১০০ কিলোমিটার পথ চড়াই-উৎরাই, পাহাড়ের অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে যেতে হয়। তাতেও সময় লাগে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। বুঝতেই পারছেন রাস্তা কত ভাল হলে এত কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করা যায়।

কামাখ্যা মন্দির নীলাচল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আট থেকে সতের শতকের মধ্যে এই পাহাড় ও মন্দিরের নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা পথে নাস্তা করতে গিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় ব্যয় করি। তবুও বেলা নয়টার মধ্যে পৌঁছে যাই। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছনোর প্রায় আধ কিলোমিটার আগে আরেক গাড়ি চালকের পরামর্শে গাড়ি রাস্তার পাশে পার্ক করে আমরা পদব্রজে উৎরাই ভেঙে চলতে থাকি। অবাক হয়ে তাকাই, অসংখ্য গাড়ি ও দর্শনার্থী। উপরের গাড়ি পার্কিং লট প্রায় পাঁচ শতাধিক গাড়িতে ভর্তি।

রাস্তার একপাশে পূজার ডালি বিক্রির দোকান। সব দোকানে কমন ফুল জবা ও ফল নারকেল। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকে বাড়ির ভিত প্রদান বা নতুন গাড়ি চালু করার আগে নারকেল ভাঙে। নারকেল সুস্বাদু ফল সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে শুভাশুভের কি সম্পর্ক তা আমার জানা নেই। যতই এগোই ততই দর্শনার্থীর ভিড়। সঙ্গে ছাগ-শাবকের আর্তনাদ। অনেকে প্রায় মুমূর্ষু দুই আড়াই কেজি ওজনের ছাগ-শিশু (পাঁঠা) কামাখ্যা মাকে নিবেদনের জন্য ডাক-ঢোল, কাঁশর বাদ্য বাজিয়ে নেচে গেয়ে চলেছে।

রাস্তার পাশে কিছু দূরে দূরে হরেক রকম সাজে সাধু সন্ন্যাসীর নানা ধরনের কসরৎ দেখানো চলছে। কথিত আছে, এখানকার সাধুরা নাকি মন্ত্রসিদ্ধ। এঁরা নানা তুকতাক, বশীকরণ, 'বাণমারা' ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণার বিনিময়ে এরা মানুষকে তা শেখায়। শেখর তার বৌকে ফোনে বলছিল, 'বেশি মেজাজ দেখিয়ো না, কামরূপ-কামাখ্যা যাচ্ছি। তুক-তাক শিখে এসে সব মেয়েমানুষকে বশে নিয়ে আসব। তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল।'

কিছুদূর ওঠার পর লেখা রয়েছে 'এখানে জুতা ও সেন্ডেল' রাখা হয়। জুতা রাখার জন্য বেশ ক'টি দোকান। দর্শনীর বিনিময়ে জুতা রাখতে হয়। এরপর খালি পায়ে হাঁটা। শীর্ষে গিয়ে চক্ষু ছানাবড়া। বিশাল লাইন। মায়ের বেদীর কাছে পৌঁছতে অন্তত তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। অতক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব নয় ভেবে আমি, গৌতম ও সুব্রত বসে পড়ি। গণেশ ও শেখর লাইনে দাঁড়ায়। এরা ইমিগ্রেশন কাস্টমস-এ যেমন করে 'ম্যানেজ' করে এখানেও দু'নম্বর পথে 'ম্যানেজ' করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফুল-নারকেল হাতে এসে হাজির। ততক্ষণে আমরা গাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।

গৌহাটিতে অনেক দর্শনীয় জায়গা আছে। কিন্তু আমাদের সময় নেই। গৌহাটি থেকে শিলং যাওয়ার পথে গৌহাটিতেই মাড়োয়ারিদের গড়া খুব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন বড়-ছোট মিলিয়ে তিনটি মন্দির পরিক্রমা করি। এগুলো বালাজি মন্দির নামে খ্যাত। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ, শ্যামল নিসর্গ ও শৃঙ্খলা সব মিলিয়ে সকল ধর্মের মানুষের জন্য বিনোদনের এক অনবদ্য আয়োজন। এর ঘিয়ে পাকানো খিঁচুড়ির স্বাদ ভুলবার নয়। তারপর কিছু দূরে দুপুরে এক পাঞ্জাবি ধাবায় খাওয়া সেরে উমিয়াম লেকে আসি।

উমিয়াম লেক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন লেকসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি পাহাড় ঘেরা। বিস্তার কয়েক কিলোমিটার। এতে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। পর্যটকরা মনে রাখবেন যে, এখানে রবিবারে সব বন্ধ থাকে। দর্শনীর বিনিময়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোও। যে কারণে আমরা অনেক দর্শনীয় স্থানে গিয়ে ফিরে এসেছি। শিলংয়ে দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হল এলিফ্যান্ট ফল, শিলং পিক, লেডি হায়দারি পার্ক, ওয়ার্ডস লেক, ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা স্টেট মিউজিয়াম, ডন বস্কো উপজাতীয় মিউজিয়াম, কীট-পতঙ্গের মিউজিয়াম, ক্রাইসেলিস গ্যালারি, ক্যাথেড্রাল অফ মেরী হেল্প অব ক্রিস্টিয়ানস, সুইট ফলস ও অন্যান্য। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল মওলিনঙ (Mawlinnog) গ্রাম। এই গ্রাম শিলং থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে, ডওকি যাওয়ার পথে। এই গ্রাম এশিয়ার মধ্যে পরিচ্ছন্নতম গ্রাম হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে।

উমিয়াম লেক থেকে গল্ফ কোর্স হয়ে আমরা ক্যাথেড্রালে পৌঁছি। গল্ফ কোর্স বসা ও বেড়ানোর সুন্দর জায়গা। এর বিশেষত্ব হল পাহাড়ের ওপরে প্রাকৃতিকভাবে উঁচু-নিচু হয়ে কৃত্রিম গল্ফকোর্সের মত গড়ে ওঠা।

এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্দর গল্ফকোর্সসমূহের মধ্যে একটি।

এটি বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। প্রাঙ্গণ ও ঘরগুলো ছবির মত সাজানো ও ছিমছাম। এখানে ক্রুশের সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক নারী। রয়েছে মা মেরীর অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য। প্রার্থনা গৃহ, শিক্ষার্থীর হোস্টেল, স্কুল সব মিলিয়ে এক নান্দনিক পরিবেশ। রয়েছে নিখুঁত পরিকল্পনা ও রুচিবোধের ছাপ। শিলং-এ প্রথম দিকে আসা মূলার সাহেবের কালো পাথরের ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে। মূলার সাহেবের উক্তি খোদিত আছে। তিনি বলেছিলেন, 'যদি খাসিয়াদের এক করতে না পারি তাহলে আমাদের এখানে আসা বৃথা।'

সন্ধ্যার ঠিক আগে ব্রাহ্ম গেস্ট হাউজে ফিরে আসি। আমি আর সুব্রত গেস্ট হাউজের রিসেপশনে বসি। অন্যরা শহরে কেনাকাটার জন্য চলে যায়। আমি সুরজিতবাবুর খোঁজ নিই। রিসেপশন জানায় যে আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবেন। মিনিট পনেরর মধ্যে তিনি আসেন। তাঁকে জানাই যে গাড়ির ড্রাইভারসহ পথচারীদের জিজ্ঞেস করে ঠাকুরের বাসভবনের হদিশ করতে পারিনি। তিনি বলেন, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন? আমার হ্যাঁ-বাচক শব্দ শুনে আমাকে বলেন 'চলুন'। তিনি পুলিশ বাজার থেকে রিলবং আসা যাওয়ার জন্য দুশো টাকা ভাড়ায় এক ট্যাক্সি নিয়ে আমি ও সুব্রতকে নিয়ে রিলবং পৌঁছন।

রবীন্দ্রনাথ দুটি বাড়িতে আতিথ্য নিতেন। একটি ব্রুকসাইটে ও অপরটি কিঞ্চিৎ দূরে জিৎভূমিতে। মেঘালয় সরকার আন্দোলনের মুখে ব্রুকসাইটের বাড়ি দখল করে রবীন্দ্র মেমোরিয়েল মিউজিয়াম তৈরি করতে বাধ্য হন। এই বাড়ির মালিক বাড়ি ভেঙে কাঠামো পরিবর্তনে উদ্যোগী হলে শিলংয়ের বিখ্যাত কবি উমা পুরকায়স্থ ও সেন্ট এডমন্ট কলেজের অধ্যক্ষ সিলভ্যানাস ল্যামারের নেতৃত্বে ঠাকুরের বাসভবন সরকারের এক্তেয়ারে আনার আন্দোলন শুরু হয়। এর সঙ্গে খাসি কবি হেমলন ডিয়েংডোও খাসিদের নিয়ে আন্দোলনে ইন্ধন যোগান। হেমলন রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*সহ অনেক রচনা অনুবাদ করেন। টেগোর'স মেমোরিয়েল প্রতিষ্ঠা তাঁদেরই আন্দোলনের ফসল। মিউজিয়াম রোববার বন্ধ থাকে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখারও উপায় নেই। কারণ পর্দাঘেরা। সাধাসিধে আটপৌরে বাড়ি। সামনে পেছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পাশে বয়ে চলেছে ক্ষীণ স্রোতস্বিনী। সামনের প্রাঙ্গণে কবির ভাস্কর্য যেন আমাদেরকে আহ্বানের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের প্রাঙ্গণে মৌন শতবর্ষী তিনটি বড় ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ আজও কবির স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে বসে *শেষের কবিতা* সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বাসভবন ছুঁয়ে আমি একটু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে সুরজিতবাবু বলেন, চলুন জিৎভূমি দেখতে যাই। ঠাকুর যেখানে বসে *রক্তকরবী* লিখেছিলেন। সেই বাড়ির উত্তুঙ্গ তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। বিশাল লোহার গেট হাতি বাঁধার শিকলে বিশাল তালাবদ্ধ। এখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই। বাড়িটি জনৈক চক্রবর্তী কিনে নিয়েছেন। বাড়ির সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর উন্মুক্ত। প্রান্তর ঘিরে ঘন পাইন ও দেরদারু গাছের নিবিড় সখ্য। তোরণের ডান পাশে শ্বেত পাথরে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রয়েছে যে এই বাড়িতে বসে কবি *রক্তকরবী* সৃজন করেছিলেন। জানা গেল স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীরা এখনও এই জিৎভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। তবে তাঁদের অভিযোগ এই বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এর জন্য ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হচ্ছে। সুরজিত বলেন, আপনারাও লিখুন না। গবেষকরা এখানে বিশ্বকবি সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তথ্য পেতে পারেন।

গেস্ট হাইজে ফিরে সুরজিতবাবু আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান যে তাঁর বোন শিলং শহরের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। বোনের নাম সুবর্ণ প্রভা দাস। তিনি ও তাঁর মা সারদা সুন্দরী দত্ত শিলংয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল কারিগর। সুরজিতের পিতামহ হার্বার্ডের ফার্মাসিস্ট। পিতা চিকিৎসক। শিলং-এ এঁদের পরিবারের সমৃদ্ধ অবদান রয়েছে। তিনিও আমার মত লক্ষ্মীছাড়া। এখন সমাজসেবাই তাঁর ব্রত। তাঁর সম্যক পরিচয় জানার কৌতূহল থাকলেও চেপে যাই। তিনিও এই ব্যাপারে উচ্চকিত নন। ১৮৯৪ সালে এখানে ব্রাহ্ম গেস্ট হাউজের পত্তন ঘটে। এখন তিনি দেখাশোনা করেন। এখানে সর্বসাধারণের জন্য একটি রবীন্দ্র গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছেন।

সুব্রত ডরমিটরিতে চলে যাওয়ার পর গৌতম আসে। মনে মনে আমাকে আমার সেই প্রশ্ন তাড়া করে। আমি সুরজিতকে জিজ্ঞেস করি, এই দুর্গম পথে কবি কিভাবে বার বার আসতেন! তখন তিনি কি ভেবে এক ভদ্রলোককে ফোন করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, চলুন কাছেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি এই শহরের আদি লোক। তাঁর মুখ থেকে শুনবেন। গৌতমসহ আমরা হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে জানালেন হাঁটা পথের আশপাশের সকল দোকান ও সম্পত্তি আহমদ হোসেন সাহেবদের। একসময় শিলংয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূসম্পত্তি তাঁদেরই ছিল। বুঝতে পারলাম আমরা আহমদ হোসেন সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি।

মেঘের আলয়

হাজার হাজার কোটিপতি আহমেদ হোসেনের বাসস্থান নিতান্তই একটি একতলা বাংলো বাড়ি। ঘরের আসবাবপত্রও সেকেলে। আমাদের পৌঁছার পর বেল টিপতেই ভদ্রলোক দরোজা খুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। সুরজিত বলেন, আহমদ হোসেন সাহেব একজন অনন্য বড় ফটোগ্রাফার। ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক তাঁর ফটো সংগ্রহশালা রয়েছে। আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্ব শেষে আহমদ হোসেন সাহেব জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি জানেন, এই শিলংয়ে বাংলাদেশের একান্নজন তরুণ কবরে শুয়ে আছেন। এই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের কবর তিনি নিজ হাতে দিয়েছেন। তারপর সংক্ষেপে তিনি তাঁর ও সুরজিতবাবুর পরমাত্মীয় সাহিত্যিক ও সমাজসেবী অঞ্জলি লাহিড়ির দীর্ঘ নয় মাসে তাঁদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালনের কাহিনি শোনান। তিনি জানান যে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি সিলেটে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কর্নেল শওকত, মেজর জিয়া ও ন্যাপের আলতাফ হোসেন। অঞ্জলি লাহিড়ি বাংলাদেশের 'আইন ও সালিশি কেন্দ্র' প্রকাশিত *স্মৃতি ও কথা* ১৯৭১ শীর্ষক গ্রন্থে সিলেট-তামাবিল সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা সবিস্তার বলে গেছেন। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে সমৃদ্ধ অবদানের জন্য ২০১২ সালে আহমদ হোসেন সাহেব ও অঞ্জলি লাহিড়িকে সম্মাননা প্রদান করায় তাঁরা গর্বিত বোধ করেছেন বলে জানান।

আহমদ হোসেন সাহেব রবীন্দ্রনাথের শিলং আসার কাহিনি জানাতে গিয়ে অনুষঙ্গ হিসেবে তাঁর পরিবারের শিলংয়ে আসার কাহিনিও সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ খান বাহাদুর হাজি কাশিমউদ্দিন মোল্লা ১৮৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বেগমপুর থেকে শিলংয়ের চেরাপুঞ্জিতে এসেছিলেন। তিনি ও তাঁর ছেলে গোলাম হায়দার চেরাপুঞ্জিতে দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছিল। এই সময় গরুর গাড়ি গৌহাটি থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে শিলং আসত। ১৮৮৭ সালে কাশেম মোল্লা ব্রিটিশ প্রশাসনকে ঘোড়ার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আনা-নেওয়ার প্রস্তাব দিলে প্রশাসন দুটি শর্ত দেন। প্রথম শর্ত ৮০টি ঘোড়া কিনতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, ১০০ কিলোমিটার পথে মোট পনেরটি আস্তাবল রাখতে হবে। কাশেম মোল্লা সেই শর্তদ্বয় পূরণ করে ঘোড়ার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আনা-নেওয়া শুরু করেন। তিনি ১৯০৬ সালে এই পথে অ্যালবিওন (Albion) নামের মোটর গাড়ি চালু করেন।

আহমদ হোসেন সাহেবের বর্তমান বয়স ৮৩ বছর। স্মরণশক্তি অসাধারণ। তাঁর ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মপুত্র নদ বেয়ে স্টীমারে গৌহাটি আসতেন। স্টীমার ঘাট থেকে গরু বা ঘোড়ার গাড়ি করে গৌহাটিতে অ্যালবিওনের স্ট্যান্ডে আসতেন। তিনি শুনেছেন, কবি একবার কাদায় পড়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে 'থাপি'-তে (চা-বাগানের কর্মীরা পিঠে যা বহন করেন) করে গৌহাটিতে আনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রুকসাইডের বাড়িতে (বর্তমান রবীন্দ্র মিউজিয়াম) বেশি সময় কাটিয়েছেন। তাঁর সেবাযত্ন করতেন আহমদ হোসেন সাহেবের পরমাত্মীয়রা। ১৯৭১ সালে শ্রীসতীশ জীবন দাস শিলংয়ের কমিশনার ছিলেন। তিনি এই বাড়িতে থাকতেন। তিনি চলে যাওয়ার সময় এই বাড়িটিকে টেগোর মেমোরিয়েল করার ব্যবস্থা করে যান।

আহমদ হোসেন সাহেব ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। এক সময় বলেন যে, শিলং থেকে সিলেট পর্যন্ত রাস্তা বানিয়েছিলেন এক ইংরেজ প্রশাসক। তিনি কন্ট্রাক্টর রাস্তা ঠিকমত বানিয়েছেন কি না তা দেখার জন্য ড্রাইভারকে তৎকালীন সময়ে গাড়ির পেছনে রাখার ঝাঁঝরায় পানি ভর্তি একটি গ্লাস বসাতে বলেন। শতাধিক কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে কোথাও যদি এক ফোঁটা পানি পড়ে তাহলে বোঝা যাবে কন্ট্রাক্টর সেইখানটায় ঠিকমত কাজ করেননি। তিনি হাসলেন। আমরাও। মনে হচ্ছিল তিনি যেন উত্তর পূর্ব ভারতের জীবন্ত বিশ্বকোষ। আমাদের দুর্ভাগ্য, বেশিক্ষণ বসার জো ছিল না। শিলংয়ে রাত আটটার পর খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তাঁকে ও মহান পরোপকারী সুরজিতবাবুকে বাংলাদেশে আসার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিই। সুরজিতবাবু বললেন, আপনাদের কাল সকালে ৭টায় বেরোনোর আগে আমি বাড়ি থেকে অঞ্জলি লাহিড়ির দুটো বই পাঠিয়ে দেব। দিয়েছিলেনও। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পাইনি। এখানে এসে ই-মেইল করেছি। জবাব পাইনি।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা ছিল সকালে দ্রষ্টব্য স্থান দেখে দেখে ডওকি চলে যাব। কিন্তু দেখব কী করে! দশটার আগে কেউ কি অফিস খোলে? সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শিলং পিক বা শৃঙ্গ দেখা। এটি এয়ারফোর্সের ঘাঁটির ভিতরে। গেইটে পাসপোর্ট, ক্যামেরা, মোবাইল জমা রেখে, বডি সার্চ সেরে ঢোকানো হয়। আমরা গেইটের কাছে গিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেখে হা-হতোস্মি হলাম। ভারতীয় ছাড়া বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইরে জানলাম পাসপোর্টধারী বঙ্গ সন্তানদের নিষেধ না মেনে গোপনে ছবি তোলার অপরাধে নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লি থেকে এই আদেশ এসেছে। আমি তোরণ পেরিয়ে ভিতরে গিয়ে অফিসারের সঙ্গে কথা বলি। তিনি বিনীতভাবে তাঁর অপারগতার কথা ব্যক্ত করেন। শৃঙ্গে এক প্রবীণ ভদ্রমহিলার দোকানে লুচি ও আস্ত ছোলার তরকারি দিয়ে নাস্তা সারি।

এরপর এলিফ্যান্ট ফলস। কী বৃষ্টি! ছাতা আছে কেবল আমার। বাবুরা বিশ টাকা ভাড়ায় ছাতা নিয়ে জলপ্রপাত দেখতে নেমে যায়। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম ১৯৮টা সিঁড়ি ভেঙে নামতে হবে। প্রতি সিঁড়ি উচ্চতায় দুই থেকে আড়াই ফুট। ভেবে দেখলাম নামতে হয়তো পারব। উঠতে ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। বিদেশ বিভূঁইয়ে সাথীরা বিপদে পড়বে। তদুপরি, ফলসে নামার মুখে এর ইতিহাসে লেখা রয়েছে, ব্রিটিশরা এলিফ্যান্ট ফলস নাম রেখেছিলেন। কারণ ফলসের পাশের ভূভাগ হাতির মত দেখাত। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সেই অঞ্চল ধসে যায়। তাহলে এটিও অন্য পাঁচ-দশটি ফলসের মত হবে কল্পনা করে নিলাম। এই বয়সে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো ছাড়া আর কী উপায় আছে!

এরপর ডওকির উদ্দেশ্যে রওনা। সিলেটে ফোন করে তামাবিলে একটার দিকে গাড়ি পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর মেঘের বাড়ি মেঘালয়ের আসল রূপ ধরা পড়ল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ কোথাও হালকা কোথাও ঘন। মেঘ উপরে উঠে যাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে, বৃষ্টি হয়ে ভারমুক্ত হচ্ছে। আমাদের গাড়ি কোন কোন সময় মেঘের ভিতর দিয়ে চলছে। এই দৃশ্য দেখার, বোঝাবার নয়। মিজোরামে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার সাথীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে অনবরত ছবি তুলেই চলেছিল। ডওকি সেতুর কাছে আসার আগে থেকে সিলেটের জাফলং দেখা যাচ্ছিল। এরপর যথারীতি সীমান্তের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত রাজপথে সিলেটের দিকে রওনা দিই।

পাশ্চাত্যের স্কটল্যান্ড দেখার সুযোগ হলে লন্ডনে শেকস্‌পীয়রের বাসভবন হয়তো দেখতে পেতাম। শিলং গিয়ে প্রাচ্যের শেকস্‌পীয়র বিশ্বকবির অমর সৃষ্টিভূমি স্পর্শ ও চাক্ষুষ করার সৌভাগ্যও কম নয়!

তপন চক্রবর্তী
সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক

রাতের পুলিশবাজার

যোগ কেবলি যোগ নয়...

মেহরীন

যোগ কেবলি এক প্রকারের ব্যায়াম নয়। এটি আত্মার সঙ্গে দেহের যোগ। শান্তিময়তার সঙ্গে মানুষের মননের যোগ। সৃষ্টিকর্তার অনিঃশেষ দানগুলোকে বুঝে হৃদয়ঙ্গমের যোগ। যোগ আমাদের এক বিশাল পাওয়া। কতকাল পুরনো, কত ঋষিকুলের পথ হারানো শান্তির আবাস এই যোগ। কী আছে এতে তা বোঝা হয়তো সেই গৃহত্যাগী সুখী মানুষদের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

আমার সঙ্গে যোগ-এর পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। মা আমাকে নিয়ে যোগচর্চায় যেতেন। একজন শ্রীলঙ্কান ভদ্রমহিলার বাসায় লনঘেরা কাচ দেওয়া হলবারান্দায় হালকা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে চলত মেডিটেশন ও মৃদু শরীর চর্চা। চঞ্চল আমি ওই পরিবেশে খুব বাধ্য হয়ে থাকতাম। একটি শান্তিময় ভাললাগা কাজ করত। খুব শিখতে চাইতাম। মা আমাকে এই উপহারটি সেই ছোট্টকালেই দেন যা আমি আজ উপলব্ধি করি। এই শহুরে জীবনে এক প্রশান্ত ছায়া নিমেষেই গড়ে তুলতে পারি নিজের মধ্যে, নিজের মত করে।

পরবর্তী সময়ে মা নিজের বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। তৎকালীন পিজি হাসপাতাল থেকে মার কাছে রোগী পাঠাতে শুরু করেন ডাক্তাররা। হয়তো সেটাই তখনকার শরীরকে শারীরিক ক্ষমতার মাধ্যমে সুস্থ রাখার কায়দা, এখনকার সময়ের যা ফিজিওথেরাপি বলে বহুল প্রচলিত। আমি তখন ৮-৯ বছরের মেয়েটি বলে কঠিন দেহ-কসরতগুলো আমাকে দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হত। এখনও আমার ভিতর সেই দিনগুলো কাজ করে এবং নিজের ভিতর 'আমি পারি' বলে একটি তৃপ্তিও পাই। এই 'আমি পারি'টা মাঝে মাঝে যখন 'পারছি না'তে পরিণত হয় তখন এই বলার সাহসটাও যোগচর্চা আমাকে শেখায় যে 'আমি পারব'।

আমার বড়বেলার যোগচর্চা শুরু হয় ভারতীয় হাই কমিশনের যোগ-এর ক্লাস থেকে, গুলশান ২-এ অবস্থিত এক বিরাট অডিটোরিয়ামে অনেক মানুষের সঙ্গে, ইয়োগা গুরু সত্যজিৎ-এর কাছে। ব্যস্ততার মাঝে যৎকিঞ্চিৎ সম্ভব এগিয়ে যায় আমার যোগ প্রেম। সপ্তাহে ২টি দিন করে সময়ের শত প্রতিবন্ধকতার মাঝে চলতে থাকে আমার মন বিকাশের আয়োজন।

প্রতিবছর ২১শে জুনে যোগ দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অসাধারণ আয়োজন করেন ভারতীয় হাই কমিশন। ২০১৭-য় আমি প্রথম এ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পাই। মঞ্চে উপবিষ্ট সুধীজনের সঙ্গে আমি এক আনন্দঘন সময় কাটাই। এক স্টেডিয়াম-ভর্তি সচেতন মানুষ দেখতে পাই। নিজেকে আরও সচেতন করবার প্রয়াসী হই। আর্ট অফ লিভিং টিম-এর সঙ্গে আমার এই অনুষ্ঠানে যোগাযোগ হয়। আমি এই বিদ্যাও অর্জন করতে সচেষ্ট হই। আমার বর্তমান ওষুধবিহীন জীবনের জন্য এ বিদ্যা ও তার পিছের মানুষগুলো ভীষণরকম জড়িত। ২০১৮-র যোগ দিবস এক বর্ষণমুখর সকাল হলেও বিশাল আয়োজন ও লোক সমাগমে কোন কমতি লক্ষ করিনি বরং yoga mat ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গাড়ি উপহার পেয়ে উপস্থিত সমাগম লাভবান হন। সকাল বেলা এমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারা থেকেই শুরু হতে পারে নতুন এক সুন্দর জীবনচর্চা। ভোর যেমন আল্লাহ ও ভগবানের কাছে প্রার্থনার সময় তেমনি নিজেকে কিছু দেওয়ারও এটাই সময়। মনের যোগ এ সময়েই সর্বোৎকৃষ্ট থাকে দিনের অন্য সময়ের চেয়ে। সকালে ঘুম ভাঙলে কর্মময় একটি মানুষ রাতে বেশিক্ষণ জাগতে পারবেন না। এতে তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে। মস্তিষ্ক পাবে সঠিক বিশ্রাম। যোগে কোন বাড়াবাড়ি নেই। এই গুণের প্রতিই আমি মূলত আকৃষ্ট। ধীর গতিতে নিজের শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেকে কষ্ট না দিয়ে উৎকর্ষ সাধনই যোগের মূলমন্ত্র। হুলস্থুলের জায়গা নয় যোগ। না পারার দুঃখে মন খারাপের বা অসুস্থ প্রতিযোগিতার জায়গাও নয়। একটু ভাল পারেন এমন কাউকে দেখে উৎসাহ পাবার জায়গা বরং। এটি অবশ্যই গুরুমুখী। খুঁটিনাটি বিষয় যেমন নিশ্বাস নেওয়া-ছাড়া, হাত সোজা বা বাঁকা, হাঁটু ভাঙার কায়দা, প্রভৃতি অনেক কিছুই গুরুর থেকে সরাসরি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ভুল হলে ভুল শিক্ষা, সুফলে বাধা হতে পারে। তাই গুরু না মিললে অবশ্যই বিচক্ষণতার সঙ্গে অন্যান্য সোর্স থেকে আগত জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। তবে সময় ও পরিস্থিতি যেমনি হোক, যোগচর্চা একটি মানুষকে সুস্থ রাখতে পারে, ডাক্তারকে দূরে রাখতে পারে, নিজের ওপর আস্থা বাড়াতে পারে ও ওষুধ নামক সেবনবিধি থেকে মুক্তি দিতে পারে। ঝরঝরে একটি হাসিমাখা মুক্তজীবন কেবল দিতে পারে যোগাশ্রয়।

একটি উদাহরণ না দিলেই নয়। যান্ত্রিকজীবনে রাস্তা-ঘাটে চলতে ফুসফুসের ওপর প্রচণ্ড ধকল যায়। কাপড় ধোওয়ার মত, সুবাতাসে অভ্যস্ত ফুসফুসেরও ক্লিনসিং বা পরিশীলন দরকার হয়ে পড়ে। সাধারণ প্রাণায়াম, বাম নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে, দ্বিগুণ সময়ে ডান নাক দিয়ে ছাড়াতেই হতে পারে বিরাট নিরাময়। এর সঙ্গে যদি জল নেতি ও সূত্র নেতি যোগ করা যায় তাহলে চিরতরে বিদায় নিতে পারে সাইনাস ও ফুসফুসজনিত ব্যাধি। হাঁটুর সমস্যা, নার্ভের রোগ– এসবের জন্য রয়েছে আলাদাভাবে নিরাময় কৌশল। বিক্ষিপ্ত মন একাই অনেক দুঃখের কারণ। এই মনটিকে যোগের আয়ত্তাধীন আনা, মনোযোগ বর্ধন, প্রশান্তকর মন মনন প্রাপ্তির জন্য যাওয়া যায় সুদূর হিমালয় বা সাগরস্নানে। কিন্তু সেই ক্ষণিক আনন্দ ও প্রাপ্তিটাই হতে পারে সার্বক্ষণিক যদি ঘটে যোগের সঙ্গে সেই আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক যোগাযোগ।

মেহরীন সংগীতশিল্পী

অংকন: শম্ভুনাথ গোস্বামী, ভারত

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ, যুক্তিশীল মানুষ, কর্মযোগী মানুষ, জ্ঞান ও শিক্ষিত মানুষ কাহিনি-কল্পনা-কিংবদন্তীনির্ভর কৃষ্ণকথা অপেক্ষা ইতিহাসনির্ভর কৃষ্ণকথাতে আস্থা রেখে কৃষ্ণালোচনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃষ্ণকে জ্ঞানী সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন যে কৃষ্ণ একজন আদর্শ মানুষ, ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য বা বিসমার্ক, দুষ্টের দমক শিষ্টের পালক এবং ন্যায়নীতির রক্ষক...

নিবন্ধ

কৃষ্ণ চরিত্রের সহজ পাঠ

গাজী আজিজুর রহমান

'যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।' – রবীন্দ্রনাথ

কৃষ্ণ এক মহামহিম নাম, পুরাণ-পুরুষোত্তম, ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সূত্রধর, কৌশলের চূড়ামণি, ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, ন্যায়জ্ঞ, পুণ্যাত্মা, প্রেম-প্রীতি প্রতিশ্রুতিশীল ইত্যাদি নানা গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ এবং একই সঙ্গে একজন ঈশ্বরাবতার, কিংবদন্তী পুরুষ, এক হো বহুশ্যাম। এমন এক মানুষ ও মনুষ্যাতীত মহামানবের জীবন, কর্ম, কৃতী ও কল্যাণাত্মার কোন সহজ পাঠ মূলত অসম্ভব। কারণ হাজার হাজার বছর পূর্বের পুরাণ, যদুবংশ, হরিবংশ, উপনিষদ, সংহিতা, গীতা, মহাভারত, আঙ্গিরস, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, পতঞ্জলি, মেগাস্থনিস থেকে পশ্চিমা পণ্ডিত ও দার্শনিকগণসহ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজকের নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী পর্যন্ত কৃষ্ণের যে বিস্তার, সাতকাহন কথা, গল্পগাথা, কিংবদন্তী, শাস্ত্রানুমত সে মহাভারত কথা মীমাংসার নয়। কৃষ্ণের জীবনেতিহাস নিয়ে তর্কের কোন শেষ নেই। তাই শেষ কথাটি কে বলবে? ভারত বিচিত্রা সম্পাদক ও লেখক নান্টু রায় চলতি বছর (২০১৮) একটি ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬)-এর একটা সহজ পাঠ নতুন করে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করে বলতে চেয়েছেন, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র মূল্যায়ন আজও সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান।

কেবল ইতিহাস বিমুখ, অযৌক্তিক, কাল্পনিক কাহিনিতে বিশ্বাসী, কাব্য-পুরাণে আস্থাশীল, রস-রতিতে রসিত, গোলে হরিবোলে ব্যক্তিরাই কৃষ্ণকে হয় অবতার বানিয়েছে না হয় তাঁকে অন্যায়কারী, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, হীন, লম্পট, কপটরূপে চিহ্নিত করে কৃষ্ণচরিত্রকে করেছে কলঙ্কিত। ব্যাসও তাঁর ধর্ম-কর্ম নিয়ে এমন অপবাদ দিতে কুণ্ঠা করেননি। যে মান-সম্মান ঈশ্বরিত ঐশ্বর্য নিয়ে কৃষ্ণের মহাপ্রস্থান অবশ্যম্ভাবী ছিল তা করে তোলা হল তর্কিত, অসম্মানে আনত।

ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতি-অনুযোগ ছাড়া কোন মানুষ বিশুদ্ধ নয়। মানুষ হিসাবে কৃষ্ণ তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। মামাকে হত্যা, গোপীবালাদের মনে প্রেম লালসা জাগিয়ে তোলা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, যুদ্ধ নীতি না মানা, কৌলিক সম্পর্ক না রেখে রুক্মিণীকে বিয়ে করা, যুদ্ধের সমস্ত দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে গান্ধারীর অভিশাপ কুড়োনো, মদ্য পান করা ইত্যাদি নানা অভিযোগে অভিযুক্ত কৃষ্ণ কী করে আদর্শ মহাপুরুষ হবেন! কুমারিল ভট্ট এ সব প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন নানা প্রমাণ সাপেক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্রসহ আরও অনেকে সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিস্তর যুক্তি তর্কে অনুবর্তী হয়ে। তাঁরা কৃষ্ণকে ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, কর্তব্যনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ কৌশলী রাজনীতিক, ভারত বিধাতা হিসেবে চিত্রিত করেন। যে দ্রুততায় তিনি উত্তরভারতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে ছিল অবিশ্বাস্য, যা তাঁকে অলৌকিক শক্তির আধার রূপে সমুদ্ভাসিত করে।

ইতিহাসের মানুষ হিসাবে, মানুষী শক্তির মানুষ হিসাবে, আধুনিক ও লৌকিক মানুষ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিতে যত অলৌকিকতা আরোপের চেষ্টা হয়েছে, অবতারত্ব অধ্যারোপের অপচেষ্টা হয়েছে সেগুলো তিনি পরিত্যজ্য বা প্রক্ষিপ্ত অংশ হিসাবে বাদ দিয়ে যা বাঞ্ছিত ও ইতিহাসসম্মত সেটাকেই কৃষ্ণচরিতের চারিত্র্যধর্ম হিসাবে পরিস্ফুট করে লিখেছেন *কৃষ্ণচরিত্র*। নান্টু রায় যেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'কৃষ্ণ মানুষী শক্তি দিয়ে যাবতীয় কার্যনির্বাহ করেছেন, কিন্তু তার চরিত্র মনুষ্যাতীত। এ রকম মানুষী শক্তির দ্বারা অতি মানবীয় চরিত্রের বিকাশ থেকে তাঁর মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমান করা উচিত কিনা তা পাঠক নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করবেন। আমরা শুধু কৃষ্ণের চরিত্র ঘিরে যে অলীক কুতর্ক কুনাট্য ঘনিয়ে উঠেছে নির্মোহভাবে সে-সব জঞ্জাল সরিয়ে পরম জ্ঞানী লোকাতীত মহিমাময় মহত্তর মানুষটির জীবনেতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।' (ভূমিকা, কৃষ্ণচরিতের সহজ পাঠ)

ড. সুকুমার সেন কোঁৎ-এর মনুষ্যত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিভিন্ন ধারাগুলির পৌর্বাপর্য্য বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অলৌকিক ও অযৌক্তিক অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং আদর্শ প্রকটিত করিয়া ইংরেজি শিক্ষিতের গ্রহণযোগ্য করাই কৃষ্ণচরিতের উদ্দেশ্য।... কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যে মননশীল এবং শাস্ত্র বিচারের কষ্ঠিতে যাচাই করিবার মত স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা তখনকার পক্ষে অত্যন্ত অসাধারণ।' (*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১) বঙ্কিম পক্ষে এসব মত সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত না হয় না হোক অন্তত তারা এর অনুশাসনে আসাটাই আশার। বঙ্কিম মূলত চেয়েছিলেন পুরাণের, কাব্যের ধর্মপুরুষ কৃষ্ণ নন, ইতিহাসের জীবনধর্মী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্মসমূহে মানুষ আকৃষ্ট হোক, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ থেকে বেরিয়ে গীতার কর্মযোগী কৃষ্ণকে গ্রহণ করুক।

তৈত্তরীয় আরণ্যকের বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ আর ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এক নয়, আবার এক, শতবর্ষ ব্যবধান হলেও। দুটি ঘটনার এমন ঐক্যকে ইংরেজিতে বলা হয় Syncretism, তবেই না কৃষ্ণলীলা! এছাড়া বৃন্দাবনী কৃষ্ণলীলা, গোপীবালাদের কৃষ্ণ, রাধার কৃষ্ণ, বস্ত্রহারী রাসবিহারী কৃষ্ণ, মুরলীধর কৃষ্ণ, বাসুদেব কৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ কত না রূপ তার– এই বহুরূপী কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তাকাশ থেকে উধাও। তাঁর কৃষ্ণ ইতিহাস ও মহাভারতের কৃষ্ণ, ফুলের ফোটা থেকে যাত্রা।

ধর্ম ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী দেবতা। মহাভারতে তিনি মানুষ। সেখানে তিনি কখনও নিজেকে ঈশ্বর বা অবতার বলেননি। বঙ্কিম সেই সূত্র ধরেই বলেছেন, 'কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি তো নিজে সে কথা মুখেও আনেন না, পুনঃ পুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য করেন।" (কৃষ্ণচরিত্র, পৃ. ২৩৪) কিন্তু অধিকাংশ দেশি-বিদেশী লেখক কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক অপেক্ষা পৌরাণিক চরিত্র হিসাবে প্রচারে পারঙ্গম। যেমন করা হয় রামকে। এই দেবত্ব আরোপের অক্লান্ত চেষ্টাই কৃষ্ণকে করেছে বহু বিতর্কিত সমস্যাবাসিত। এরা কৃষ্ণের দু'কুল বজায় রেখে তাঁকে দেব ও মানুষ এই সমীকরণে প্রয়াস পেয়েছেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করার। এতে কৃষ্ণচরিত শুধু জটিল ও কঠিন হয়েছে যুগে যুগে। এমন গোজামিলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বৃন্দাবনের কিশোর কৃষ্ণ, ব্রজলীলা অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ, পদাবলীর কৃষ্ণ, ভগবান কৃষ্ণের কী হবে? উত্তর, তিনি ছিলেন পূজ্য, আছেন মানুষ ও অবতাররূপে। কৃষ্ণের জীবনধর্মই হচ্ছে তাঁর ধর্ম, মহাভারতে সেই কাহিনিই রূপে-রসে বহু ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত। প্রশ্নটা হচ্ছে পুরাণ-পদাবলী থেকে ভাসের নাটক, ঋকের বিষ্ণু ও কৃষ্ণ মিথলজি আমরা মানব, না বীরদের বীর, অপরাজেয়, ধর্মাত্মা, নীতি-বেদজ্ঞ অনুষ্ঠেয় কাজে সদাতৎপর, ন্যায়-নিরপেক্ষ, নিস্পৃহ, নির্মম এবং ক্ষমাসুন্দর, প্রেম-প্রীতিময়-প্রিয়জন কৃষ্ণকে আমরা মান্য করব। মহাপুরুষোপম গুণান্বিত মানুষ সম্পর্কে অতিরঞ্জন কাহিনী কিংবদন্তী তৈরি হতেই পারে, হয়েছে, তার প্রমাণ রাম, যিশু, ঈসা, মুসা, অ্যাপোলো আরও কত না মুনি-ঋষি-দরবেশ সে উদাহরণে উজ্জ্বল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ, যুক্তিশীল মানুষ, কর্মযোগী মানুষ, জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষ কাহিনি-কল্পনা-কিংবদন্তীনির্ভর কৃষ্ণকথা অপেক্ষা ইতিহাসনির্ভর কৃষ্ণকথাতে আস্থা রেখে কৃষ্ণালোচনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃষ্ণকে জ্ঞানী সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন যে কৃষ্ণ একজন আদর্শ মানুষ, ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য বা বিসমার্ক, দুষ্টের দমক শিষ্টের পালক এবং ন্যায়নীতির রক্ষক। তাঁর আলোচনায় তাই পূর্ণ কৃষ্ণ নেই, অর্ধেক কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি লড়াই করেছেন, যে কৃষ্ণ কর্মী, যে কৃষ্ণ কর্তব্যনিষ্ঠ, যে কৃষ্ণ কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদী– সেই কৃষ্ণই তাঁর আদর্শ।

বঙ্কিম আধুনিক ইউরোপীয় জীবনদৃষ্টির ছাঁচে গড়া একজন মানুষ। তাই তাঁর লেখাসমূহে যে নীতি, আদর্শ, ধর্মাদর্শ, জাতীয়তা, অতিপ্রাকৃততা থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত আত্মবিচারে তাঁর গড়া মানব-মানবীরা বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। তাঁর আঁকা চরিত্রমাত্রই ইতিহাসনিষ্ঠ, স্বাধীনতাপ্রিয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল, স্বদেশপ্রেমে প্রোজ্জ্বল এবং সুন্দর ও শস্যশীল। এসব লক্ষণ উনিশ শতকের বঙ্গ সমাজে একটা অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল নবচেতনায়। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাইতো ঘটেছিল নবজাগরণ। বঙ্কিম বুদ্ধিবাদী মানুষ কিন্তু হৃদয়কে অস্বীকার করে নয়– প্রেম-সৌন্দর্য-প্রকৃতিকে তিনি দান করেছিলেন তিলোত্তমা স্বরূপ। কিন্তু এই বোধগুলো যে আবার সর্বনাশের তাও তিনি জানতেন বলেই শৈবালিনী, রোহিণীদের বাঁচা নেই। তিনি প্রাচ্য দর্শনকে অস্বীকার করেননি, হিন্দুয়ানীকে অস্বীকার করেননি, কিছু কিছু সংস্কারকেও অস্বীকার করেননি। বঙ্কিমের এই মানসপ্রবণতাটা বুঝলে কৃষ্ণচরিত্র রচনায় কেন তিনি ব্যতিক্রম হলেন বোঝা কঠিন নয়। ভারতবর্ষের প্রয়োজনে তিনি খুঁজছিলেন এক বীর ও মহানকে, আদর্শনিষ্ঠ ও সংশপ্তক মানুষকে যিনি হবেন চিরায়ত ভারতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, অনুকরণীয় মানুষ। সেই মানুষ হলেন তাঁর কৃষ্ণ, যিনি অতিমানুষী শক্তির বৈরী, যিনি কোন বুজরুকি-ভেলকির আশ্রয় নেন না, নিজের ওপর দেবত্ব আরোপ করেন না। সেই বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, লীলা-লাস্যবিবর্জিত মানুষ, আষাঢ়ে গল্পবিরোধী মানুষ, উপাখ্যান অশ্রদ্ধেয় মানুষ– সেই মানুষকে তিনি আবিষ্কার করেছেন মহাভারতের দৈব-দুর্গে, যিনি ঈশ্বর না আদর্শ মানুষ, তারপর তিনি কতটা ধার্মিক কতটা প্রেমিক, কতটা অলৌকিক– যে যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেখুক। বঙ্কিমের কৃষ্ণ মানুষের এক মহা মডেল। হিউম্যানিস্ট বঙ্কিমের মানসপুত্র হচ্ছেন কৃষ্ণ।

মহাভারত এবং গীতার কৃষ্ণ ছিলেন বঙ্কিমের আদর্শ। তাই তাঁর চরিত্রের সততা, ন্যায়পরতা, আদর্শ, আইন, বিচার, দায়িত্ব পালনে যে কঠোরতা, তা ছিল একজন বিচারকের মতই নির্মম। দণ্ডদানে বিচারক যত ব্যথিত হোন না কেন, তিনি নিরুপায়। গীতাকার এই শিক্ষা যেমন কৃষ্ণের, তেমনি বঙ্কিমের। গীতা বলছে, যা অনুষ্ঠেয় তা করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষা না করেই। ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ অবশ্য পালনীয়। শোকের অযোগ্যের জন্য শোক কোরো না। কারো মৃত্যু নেই, আত্মা অমর। কর্তব্য ও কর্মসাধনে আপন-পর নেই। মানী ব্যক্তির অখ্যাতি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। গীতার এই

সব বাণীর আধার হচ্ছেন কৃষ্ণ। মীমাংসা দর্শনে আছে তিন কর্মযোগ– নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম। কৃষ্ণের কাছে এই কর্ম দু'রকম– সকাম ও নিষ্কাম। তবে তাঁর ঝোঁক বেশি নিষ্কাম কর্মে, কারণ অনাশক্তিই নিষ্কাম কর্মযোগের নৈতিকাদর্শ। আসক্তি বর্জন করে মনকে মুক্ত রেখে কাজ করতে হবে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য। তাই কৃষ্ণ কোনদিন ক্ষমতাসীন হননি, কর্মফল ভোগ করেননি। তিনি বলেন, প্রেম- ভালবাসার সঙ্গে কর্তব্য করলে কর্মে বন্ধন থাকে না। প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত সত্তা চিরকাল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত– এই তিনে মিলেই বেদান্তের স্বরূপ। কৃষ্ণ সে কারণেই অর্জুনকে বলেন, আমি কর্ম করি জগতকে ভালবাসি বলে, পরমেশ্বরও ভালবাসেন জগতকে নিরাসক্তভাবে, আমাদের নীতিও তাই, ফললাভে প্রলুব্ধ হোয়ো না।

মহাভারতের পরবর্তী সকল পুরাণে কৃষ্ণ ঈশ্বরায়িত এবং পূজ্য। তাঁর বাসুদেব নামটি তো ভগবানেরই সংজ্ঞা। *মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ* গ্রন্থে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি বলেন, 'বঙ্কিমের কৃষ্ণ আদর্শবাদী নেতা কিংবা মহাভারতের 'বিসমার্ক' হন না কেন, তবু তিনিই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নন' এই মত নানা কারণে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ যুগে যুগে যা সমাজে স্বীকৃত, প্রচলিত তাই এক সময় ইতিহাস হয়ে যায়, ঐতিহাসিক বনে যান কালের পুতুল। যে কালের সমাজে যা চলে তাই যুগধর্ম। ঐতিহাসিক যা লেখেন তাই অখণ্ড সত্য– চিরন্তন এমন মনে করাটা সমীচিন নয়। সত্য মিথ্যা কল্পনা মিলিয়েই সত্য ও ইতিহাস। সুতরাং বঙ্কিমের কৃষ্ণবিচারও চূড়ান্ত নয়। তবে তাঁর ইতিহাস চেতনা, সত্যকে প্রমাণ করার সাধনাকে সম্মান করতেই হয়। ইতিহাসে ফুলের কুঁড়ির ইতিহাস জরুরি নয়, তাই কৃষ্ণের শৈশব-কৈশোরও ইতিহাসের জন্য জরুরি নয়– ইতিহাস হচ্ছে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল সরিয়ে প্রয়োজনটুকুর বিস্তার।

জ্ঞানের মাত্রা বহুজ্ঞাত থেকে স্বল্পজ্ঞাতের দিকে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যের কারবার করেছেন কৃষ্ণ চরিত্র রচনায়। তাঁর লক্ষ্য মানুষ কৃষ্ণ, মহান ভারতের নির্মাতা কৃষ্ণ, দোষে-গুণে কৃষ্ণ। তিনি তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ করে তাঁর দোষ ঢাকার চেষ্টা করেননি। তাঁকে মহান করার জন্য, মানবের মান্য করার জন্য যা কিছু প্রক্ষিপ্তযোগ্য প্রক্ষিপ্ত করে, ছাটাই করে অর্ধেক হলেও মানুষ কৃষ্ণকেই উপস্থিত করেছেন পজেটিভ অর্থে। কৃষ্ণ তাঁর গ্রান্ড ম্যান– যাঁর আছে বিষয়বুদ্ধি, পরমার্থ জ্ঞান, বাস্তবজ্ঞান, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সত্য ও কর্তব্যের প্রতি অবিচলতা, ন্যায়-নীতির অটলতা। যুদ্ধ ছাড়া যে-কোন জয়ের আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব। তাই যুদ্ধ। ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও যুদ্ধ। রক্তপাত মৃত্যু ঘটিয়েও যুদ্ধ, নইলে এক ভারত গড়া সম্ভব ছিল না, কৃষ্ণ তাই ভারতের স্থপতি।

মহাভারত এক মহাকাহিনির আধার। অসংখ্য ঘটনা, চরিত্র, মৃত্যু, রথ, ঘোড়া, গজ, সারথি মারণাস্ত্রের ঝনঝনানিতে এই যুদ্ধ ভীত প্রকম্পিত– যা কেবল ইলিয়াডের সাথেই তুলনীয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একই বংশোদ্ভূত (চন্দ্রবংশীয়) কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে। যুদ্ধটা ছিল ধর্মযুদ্ধ, ন্যায়-নীতি, আদর্শ ও সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। শত ভ্রাতার কৌরব আর পঞ্চভ্রাতার পাণ্ডব– স্মরণ করিয়ে দেয় অসম যুদ্ধকে, তাই সমতা আনতেই যেন কৃষ্ণের পাণ্ডব পক্ষ নেওয়া। যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য। পাণ্ডবরা সচ্চরিত্রের, কৌরবরা অসচ্চরিত্রের। রাজার ছেলে রাজা হবে এই নীতি লংঘন করে কৌরব অধিকর্তা দুর্যোধন। তাই সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা বা নিয়ম রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ। তাছাড়া দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, শর্তভঙ্গের জন্যেও এই যুদ্ধ, মানীর মান রক্ষার জন্যও এই যুদ্ধ– যা গীতার ধর্ম। কিন্তু দুর্মতির কখনও সুমতি হয় না। এ যুদ্ধ সুমতি ফেরানোরও।

এখানে কৃষ্ণ তৃতীয় পক্ষ, কিন্তু ন্যায়যুদ্ধের কারণে পাণ্ডবসখা, অর্জুনের সারথি। কৃষ্ণ সম্পর্কে পাণ্ডবদের ভাইও। তিনি কৌরবদের পরাজয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের দুরাচারী আচরণের কারণে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও হিংসা-দ্বেষ-মিথ্যাচারের কারণে। পাণ্ডবদের অবস্থান তার বিপরীতে। সুতরাং পাণ্ডবরা জয়ী হয়ে ভারতের স্থিতি আনুক, সমৃদ্ধি আনুক এটাই কৃষ্ণের ভাবনা। পাণ্ডবরা জিতলও বটে কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিতে যুদ্ধের ফলাফল হল শূন্য। পরীক্ষিৎ আর কৃষ্ণ ছাড়া সবই মহাশ্মশান। এটাই যুদ্ধের ট্রাজেডি। কিন্তু ট্রাজেডি ছাড়া মহৎ কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় না।

বঙ্কিমের আদর্শ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ এ কারণে যে ক্ষতির বিনিময়েও কৃষ্ণ ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখানে তিনি কান্টের নৈতিক আদর্শ নীতির অনুসারী। কর্ম ও কর্তব্যে বঙ্কিম মহাভারত-গীতা ও কান্টের কার্যদর্শনে একাত্ম। বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধর্মযোগী হতে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সর্বোচ্চ নৈতিকতায়। ইতিহাসনিষ্ঠ বঙ্কিমের বক্তব্য, 'ভারতবর্ষ যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত... ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরল সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই, শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই, উন্নতি নাই', অতএব যুদ্ধ অনিবার্য। তাঁর এই দূরদর্শী রাজনীতি, কূটকৌশল, ক্ষাত্রধর্ম রক্ষার রূপ প্রশংসনীয়। যেটুকু নিন্দা সে ধর্মাধর্মের দৃষ্টিতে। জ্যোৎস্নার তুলনায় চাঁদের কলঙ্ক কিছু নয়। কেবল কৃষ্ণবিদ্বেষীরা তাঁর দোষ খুঁজে বেড়ান।

কৃষ্ণ চেয়েছিলেন কংস, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, শল্য বধে যদি দু'পক্ষের কিছু ক্ষতি হয় হোক, ভারত ভারমুক্ত হোক। বঙ্কিমও তা সমর্থন করেছিলেন ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে। মৃত্যু ধ্বংস যুদ্ধের অঙ্গ কিনা সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে; তিনি মানুষ না অবতার, সে তর্কও চলতে পারে কিন্তু বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র যারা মন দিয়ে পড়েছেন তারা তাঁর জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি, নীতি, কর্ম ও কৃতীকে সমর্থন করবেন এবং কর্মবিচারে আধুনিক মনের পরিচয় দেবেন। এই বিষয়টি নান্টু রায় সহজ করে বলার চেষ্টা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি মনে-প্রাণে আধুনিক মানুষ, অনুধ্যায়ী মানুষ, কর্মে বিশ্বাসী মানুষ, বঙ্কিমকে তাই তাঁর নতুন করে পাঠকসমাজে টেনে আনা। কৃষ্ণচরিত্রকে বলা হয় হিউম্যানিস্ট বঙ্কিমের মনস্বিতার পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণচরিত্রের সহজ পাঠ পড়ে আরেকবার সেই সত্যের মুখোমুখি হওয়া যায়। নান্টু রায় ধন্যবাদ পাবেন বঙ্কিমচন্দ্রের আজকের পাঠকের পক্ষে দুষ্পাঠ্য *কৃষ্ণচরিত্রকে* বঙ্কিমীগাম্ভীর্য বজায় রেখে সহজপাঠে রূপান্তরের কষ্টস্বীকারের জন্য। *কৃষ্ণচরিত* এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মত চিরায়ত একটি গ্রন্থ বটে। নাতিদীর্ঘ এ গ্রন্থের দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ এঁকেছেন ভারতীয় শিল্পী শম্ভুনাথ গোস্বামী। গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন প্রকাশিত কৃষ্ণচরিতের প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৮। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

গাজী আজিজুর রহমান শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

এক নজরে কর্নাটক

দেশ	ভারত
রাজধানী	বেঙ্গালুরু
জেলা	৩০টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার	
• রাজ্যপাল	বাজুভাই বালা
• মুখ্যমন্ত্রী	এইচ ডি কুমারস্বামী
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট
ক্ষেত্রফল	
• মোঁ	১৯১,৭৯১ বর্গকিমি (৭৪,০৫১ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৭তম
জনসংখ্যা	
• মোট	৬১,১৩০,৭০৪
• ক্রম	৮তম
• ঘনত্ব	৩২০/বর্গকিমি (৮৩০/বর্গমাইল)
সরকারি ভাষা	কন্নড়
সাক্ষরতার হার	৭৫.৬০%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
ISO 3166 code	IN-KA
ওয়েবসাইট	www.karnataka.gov.in

বাজুভাই বালা
রাজ্যপাল

এইচ ডি কুমারস্বামী
মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য পরিচিতি

কর্নাটক

জি কে ঘোরি

ভারতীয় রাজ্য কর্নাটক, সাবেক (১৯৭৩ সাল পর্যন্ত) মাইসোর, উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে গোয়া ও মহারাষ্ট্র, পূর্বে তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ-পুবে তামিলনাড়ু, দক্ষিণে কেরালা এবং পশ্চিমে আরব সাগর। রাজ্যটি উত্তর-দক্ষিণে ৪২০ মাইল (৬৭৫ কিমি) এবং এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩০০ মাইল (৪৮০কিমি) লম্বা। এর উপকূলের দৈর্ঘ্য ২০০ মাইল (৩২০ কিমি)। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে অবস্থিত বেঙ্গালুরু রাজ্যের রাজধানী।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার মাসে মাইসোর ছিল সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল প্রিন্সলি স্টেট যার ক্ষেত্রফল ছিল ৩০ হাজার বর্গমাইল (৭৮ হাজার বর্গ কিমি)। এটি কর্নাটক মালভূমিতে অবস্থিত।

সোমনাথপুরায় অবস্থিত কেশব মন্দির

বিলিগিরি রঙ্গন পর্বতমালা

১৯৫৩ ও' ৫৬ সালে অতিরিক্ত ভূখণ্ড হস্তান্তরের ফলে কন্নড়ভাষী মানুষের এ অঞ্চলটির সীমান্ত আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৯৭৩ সালে গৃহীত রাজ্যের বর্তমান নাম কন্নড় ভাষায় 'উচ্চভূমি'। ক্ষেত্রফল ৭৪ হাজার ৫০ বর্গমাইল (১ লাখ ৯১ হাজার ৭৯১ বর্গ কিলোমিটার); ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ৬ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার ৭০৪।

ভূমি

ভূমিরূপ, নদীনালা ও মাটি

ভৌতভূগোল অনুসারে কর্নাটককে ৪টি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়– উপকূলীয় সমভূমি, পার্বত্য অঞ্চল (পশ্চিমঘাট), পুবের কর্নাটক মালভূমি এবং উত্তর-পশ্চিমের কালো মাটির রেখা। উপকূলীয় সমভূমি মালাবার উপকূলের উত্তরাঞ্চলীয় বর্ধিতাংশ। ছোট ছোট পলিমাটির সমভূমি ও লেগুন অধ্যুষিত দ্বীপাঞ্চলটি বালির স্তূপে পরিপূর্ণ। সমগ্র উপকূলটি দুর্গম, সমুদ্রপথে প্রবেশ সহজ।

উপকূলীয় সমভূমির পুবে অবস্থিত পশ্চিম ঘাট ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। উচ্চতা আড়াই থেকে তিন হাজার ফুট (সাড়ে সাতশো থেকে নয়শো মিটার)। ঘাটের উপরের উপত্যকা মালনাড় নামে পরিচিত। অঞ্চলটি জলবাহী, একাধিক খরস্রোতা নদী সমভূমিতে নেমে এসেছে, যার মধ্যে আছে শরবতী নদী, তৈরি করেছে ভয়ংকর জোগ (গারসোপ্পা) জলপ্রপাত (উচ্চতা ৮৩০ ফুট, ২৫৩ মিটার)।

অন্যান্য নদীর মধ্যে আছে দক্ষিণে কাবেরী, উত্তরে কৃষ্ণা নদীর শাখা তুঙ্গভদ্রা– বিসর্পিল পাহাড় থেকে পুবমুখী ঢালু কর্নাটক মালভূমিতে পতিত হয়েছে। এই সমভূমিকে বলা হয় ময়দান। মালভূমি অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় দেড় হাজার ফুট (৪৫০ মিটার)।

কর্নাটক রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশ ভূমিরূপের চেয়ে এর মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিচিত। এ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরি রেগুর নামে এক ধরনের মাটির সৃষ্টি করেছে, যা গলিত জীবদেহসমৃদ্ধ। ভারতে তুলা উৎপাদনের জন্য এ মাটি বিশেষ উপযোগী। এর বিপরীতে সন্নিহিত কর্নাটক মালভূমির মাটি সাধারণত জলপরিবাহী, অনুর্বর, এর ব্যতিক্রম অবশ্য নদীগর্ভগুলো, সে-মাটি দোঁআশ, কমবেশি উর্বর। উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলে আছে লৌহসমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ এলাকার মাটি ও উপকূল বরাবর বালিযুক্ত পলির আস্তরণ।

জলবায়ু

কর্নাটকের জলবায়ু প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয়– শীত (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি), গ্রীষ্ম (মার্চ-এপ্রিল-মে), উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বর্ষাকাল (জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) এবং মৌসুমি-উত্তর শারদ-হৈমন্তিক ঋতু (অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত)। শীতে সর্বোচ্চ দৈনিক তাপমাত্রা উপরে ৮০° ফারেনহাইট, নিচে ৩০° সেলসিয়াস, অন্য দিকে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১০০° ফারেনহাইট (প্রায় ৪০° সেলসিয়াস)। ময়দানের শুষ্কতর অংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ২০ ইঞ্চি (৫০০ মিমি)। উপকূলীয় সমভূমির ভিজা অংশে প্রায় ১৬০ ইঞ্চি (৪ হাজার মিমি)। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বার্ষিক বৃষ্টিপাত বেশি, বাকিটা মৌসুমি-উত্তর ঋতুতে প্রবাহিত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বৃষ্টিপাত। শীতে মাসগুলো বিশেষভাবে শুষ্ক।

প্রাণি ও উদ্ভিদ জীবন

কর্নাটকের উপকূলীয় সমভূমির সেগুনবাগিচাগুলো নারকেলবীথি পরিবেষ্টিত, পশ্চিমঘাটের মলনাড় এলাকা মৌসুমি বনাঞ্চলে (বৃষ্টি বনাঞ্চল) পরিপূর্ণ, অন্যদিকে ময়দানের শুষ্ক সমভূমি গুল্ম বন ও গুল্ম ভূমিতে পরিকীর্ণ। বৃষ্টি বনাঞ্চল বিশেষভাবে বন্যপ্রাণিসমৃদ্ধ, যার মধ্যে আছে বাঘ, হাতি, গাউর (বনগরু) ও হরিণ। ময়দানে বুনো শুয়োর, ভল্লুক ও চিতার বসবাস। রাজ্যের পক্ষীকুলের মধ্যে ময়ূরের সংখ্যাধিক্য। কর্নাটকের বণ্যপ্রাণি অভয়ারণ্যের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমের বড় ডান্ডেলি বন্যপ্রাণি সংরক্ষণশালা অন্যতম, যা গোয়ার মহাবীর সংরক্ষণশালার গায়ে গিয়ে মিশেছে। রাজ্যে অনেকগুলো জাতীয় উদ্যান রয়েছে, যার মধ্যে দক্ষিণের বাঁদিপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্যান সবচেয়ে বিখ্যাত, এটি তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী। এছাড়া কেরালার সীমান্তবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত নগরহোল অন্যতম আরেকটি জাতীয় উদ্যান। পশ্চিমঘাট জীববৈচিত্র্যে ভরপুর অন্যতম দ্রষ্টব্য।

কাবানি নদীতে হাতিকে স্নান করাচ্ছে মাহুত

বেঙ্গালুরুর হাই কোর্ট ভবন

শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের গ্রীষ্মাবকাশযাপন প্রাসাদ দরিয়া দৌলতবাগ

মাইসোরের গ্রামে চাষীদের ধান চাষ

মানুষজন ও জনসংখ্যার গঠন

দ্রাবিড়ী ভাষামালায় কথা বলা কর্নাটকের অধিকাংশ মানুষ ভারতের তথাকথিত দ্রাবিড়ী মানুষের উত্তরসূরী যারা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৫০০ শতাব্দে এশিয়া উপমহাদেশের ইন্দো-আর্য ভাষামালার মানুষদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। উত্তর ভারতের ভারতীয় আর্যদের থেকে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ীরা বিচ্ছিন্ন থাকলেও শত শত বছরের মেলামেশার ফলে অনেক অভিন্ন ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। আজ কর্নাটকের উত্তরাঞ্চলে এ ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির বহু নজির দেখা যায়।

দ্রাবিড়ী ভাষার অন্যতম কন্নড় অধিকাংশ মানুষের ভাষা এবং রাজ্যের সরকারি ভাষা। ব্যবসায়-বাণিজ্যে কখনও কখনও হিন্দি ব্যবহৃত হয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অন্যান্য ভাষা যেমন তামিল ও তেলুগু (উভয়েই দ্রাবিড়ী ভাষা) এবং মারাঠি ও কোঙ্কনি (উভয়েই ভারতীয় আর্য ভাষা) প্রচলিত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কর্নাটকের মাঙ্গালুরু (মাঙ্গালোর) শহরে কোঙ্কনি ভাষা অধিক প্রচলিত। সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রাজ্যের প্রধান ধর্ম। একদা বিস্তৃত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা এখনও রয়েছেন। অল্পকিছু মানুষ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারী।

বসতির ধরন

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কর্নাটকের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামে বাস করত, তবে শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে শহরে বসতি স্থাপনের হার ক্রমশ বাড়ছে। প্রধান দুই নগরী বেঙ্গালুরু ও মাইসুরু (মাইসোর বা মহীশূর) রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। অনান্য শহুরে বা আরবান কেন্দ্রের মধ্যে আছে হুবাল্লি-ধারওয়াড়, মোঙ্গালুরু, বেলাগাবি (বেলগাউম), কালবুরাগী (গুলবার্গা), দবনগিরি, বল্লারি (বেল্লারি), শিবমোগ্গা (শিমোগা), বিজয়পুর (বিজাপুর) ও রাইচুর।

অর্থনীতি: কৃষি ও বন

রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত। উপকূলীয় সমভূমিতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হয়। ধান প্রধান খাদ্যশস্য, আরও আছে সরঘুম (জওয়ার) ও মিলেট (রাগি)। আখ প্রধান অর্থকারী ফসল। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে আছে কাজুবাদাম, দারচিনি, পান-সুপারি ও আঙুর। পশ্চিমঘাটের শীতল ঢালে কফি ও চা চাষ করা হয়। কর্নাটক ভারতের কফি উৎপাদনের প্রধান উৎস। পূর্বাঞ্চলে সেচের ফলে আখ, রবার, কলা ও কমলার মত ফল কিছু কিছু জন্মে। উত্তর-পশ্চিমের কালোমাটি তুলা, তৈলবীজ ও বাদাম চাষের জন্য আদর্শ।

পশ্চিমের মলনাড় এলাকার বনাঞ্চলের চন্দনকাঠ পৃথিবীর সরবরাহের একটা বড় অংশের যোগানদাতা। মাইসুরুতে চন্দনকাঠ থেকে উৎপাদিত তেলও রাজ্যের বড় রফতানিপণ্য। অন্যান্য বনজাত পণ্যের মধ্যে সেগুন, ইউক্যালিপটাস, রোজউড, বাঁশ, ট্যানিং ডাই, আঠা ও লাক্ষা (বার্নিশের কাজে ব্যবহৃত) প্রধান।

সম্পদ ও বিদ্যুৎ

কর্নাটক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যটি ক্রোমাইটের অন্যতম প্রধান উৎস। এটি ভারতের গুটিকয় রাজ্যের অন্যতম যেখানে ম্যাগনেসাইট উৎপন্ন হয়। রাজ্যের পূর্ব-মধ্যাঞ্চলের বেল্লারি জেলায় উচ্চমানের লৌহ আকরিক মজুত আছে। বিংশ শতাব্দীতে বেঙ্গালুরুর নিকটবর্তী কোলার স্বর্ণক্ষেত্রে স্বর্ণ উৎপাদিত হত, চলতি শতকে মজুতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় খনিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কর্নাটকে কিছু পরিমাণ আলবেইট, মাইকা, তামা আকরিক, বক্সাইট ও গারনেট পাওয়া যায়।

কর্নাটকের বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদিত পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে বিতরণ করা হয়। জোগ প্রপাতের নিকটবর্তী শরবতী নদীতে নির্মিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতে কর্নাটকের অনেক শিল্প কলকারখানা চলে। এছাড়া তাপ ও বায়ুকল প্রকল্প থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

শিল্প ও উৎপাদন

ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং বেঙ্গালুরুর ভারী প্রকৌশল কারখানা চলে রাজ্যে আহরিত খনিজ সম্পদ থেকে। রাজ্যে অন্যান্য শিল্প-কারখানার মধ্যে আছে তুলার মিল, চিনি কল, কাপড় কল, খাদ্য শিল্প, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সার,

কর্নাটক সমুদ্র উপকূল

শ্রীরঙ্গপত্তনের মাদ্রাসায় ধর্মীয় অনুশীলন

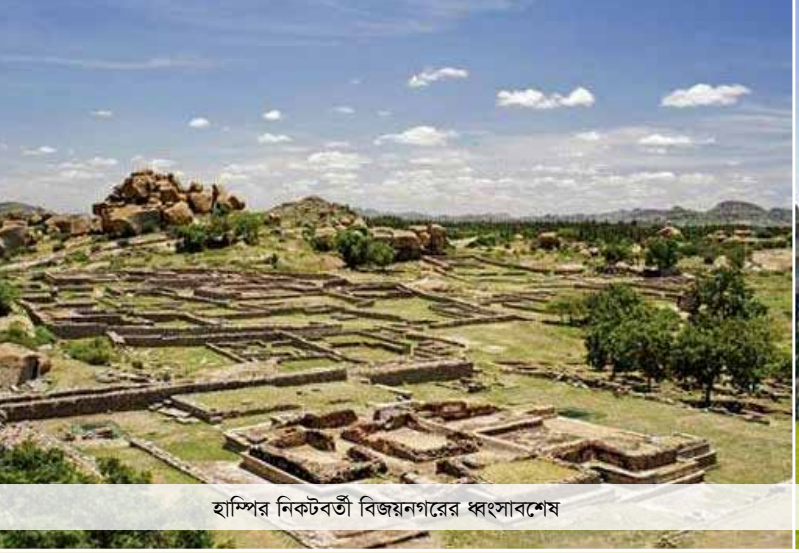

হাম্পির নিকটবর্তী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ

বেঙ্গালুরু বিধানসভা ভবন

সিমেন্ট ও কাগজকল। মাইসুরু ও বেঙ্গালুরুর দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত রেশম শিল্প ভারতের মালবেরি শিল্পের যোগান দিচ্ছে।

পরিবহন

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কারণে মালভূমির বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে ভেতরের রেলপথ সংযোগ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বেঙ্গালুরু রেল পরিবহনের প্রধান কেন্দ্র। দক্ষিণ-পশ্চিমের মাঙ্গালুরু বন্দর থেকে গোয়ার মধ্য দিয়ে উপকূল বরাবর প্রলম্বিত রেলপথ মহারাষ্ট্রের মুম্বইকে সংযুক্ত হয়েছে।

রাজ্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় প্রধানত সড়ক পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল তবে বর্ষাকালে রাজ্যর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সড়ক চলাচলের অগম্য হয়ে পড়ে। জাতীয় মহাসড়ক পূর্ব-বেঙ্গালুরু থেকে তামিলনাড়ুর চেন্নাই, উত্তরে তেলাঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, উত্তর-পশ্চিমে মুম্বই এবং পশ্চিমে হাসান হয়ে মাঙ্গালুরু উপকূল পর্যন্ত চলে গেছে। বেঙ্গালুরু, বেলগাবি ও মাঙ্গালুরুতে বিমান বন্দর রয়েছে।

সরকার ও সমাজ

ভারতের অধিকাংশ রাজ্য ও ভূখণ্ডের মত কর্নাটক সরকার ১৯৫০ সালের জাতীয় সংবিধান অনুযায়ী গঠিত। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল, ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যপালকে সহায়তা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার মুখ্যমন্ত্রীকে সহায়তা করেন মন্ত্রিপরিষদ। কর্নাটক ভারতের অন্যতম রাজ্য যেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা বিদ্যমান। বিধানসভার সদস্যরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং বিধান পরিষদের সদস্যরা বিধানসভা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক ও স্নাতকদের ভোটে নির্বাচিত হন।

রাজ্যের হাই কোর্ট দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্ত। হাই কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন অতিরিক্ত বিচারক থাকে যাঁদের রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

কর্নাটক ৪টি বিভাগে ২ ডজনের অধিক জেলা নিয়ে গঠিত। জেলার প্রশাসনিক প্রধান ডেপুটি কমিশনার, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

রোগ, মাতৃত্ব ও চাকরি ক্ষেত্রে হতাহতদের জন্য রাজ্য সরকার বিমা চালু করেছে এবং বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজনদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য সরকার কল্যাণমূলক বিভিন্ন স্কিম পরিচালনা করে থাকে। সরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা প্রদান করে থাকে।

শিক্ষা

সাক্ষরতার হার যা এ শতকের সূচনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে (জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি) পৌঁছেছিল, সেটা নিয়ে কর্নাটক বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। রাজ্যে বিপুলসংখ্যক স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার প্রায় অর্ধেকই সরকার পরিচালিত। বাকিগুলো স্থানীয় ও বেসরকারি পরিচালনা পর্ষদ পরিচালনা করে থাকে। অধিকাংশ শহর এবং গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্নাটকের প্রাচীনতম ও সুবিদিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (১৯০৯), বেঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৪) এবং ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস– তিনটিই বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত। এছাড়া মাইসুরুতে আছে ইউনিভার্সিটি অফ মাইসোর (১৯১৬); ধারওয়াড়ে আছে কর্নাটক ইউনিভার্সিটি (১৯৪৯); কালবুরাগীতে আছে গুলবার্গা ইউনিভার্সিটি (১৯৮০) এবং মাঙ্গালুরুতে আছে মাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি।

সাংস্কৃতিক জীবন

কর্নাটক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বিভিন্ন রাজবংশের অবদানে সমৃদ্ধ ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বে কর্নাটকের সাহিত্য, স্থাপত্য, লোককথা, শিল্প, সংগীত ও অন্যান্য শিল্পকলা সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। মাইসুরু থেকে ৫৬ মাইল (৯০ কিমি) দূরে অবস্থিত শ্রবণবেলগোলা এর প্রাচীন ভবন ও স্মারকস্তম্ভের জন্য বিশিষ্ট হয়ে আছে। এখানে মৌর্য সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-১৮৫) উল্লেখ করার মত নানা স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। আছে জৈন সাধক বাহুবলী

পট্টকদলে মল্লিকার্জুন ও কাশিবিশ্বনাথ মন্দির

বিজাপুরের গোলগম্বুজ

মাইসোর রাজপ্রাসাদ

(গোম্মাতেশ্বর)-র দশম শতাব্দীতে নির্মিত একক পাথরের প্রকাণ্ড ভাস্কর্য। ভারতের কন্নড়ভাষী এলাকায় এ ধরনের বিরাট একক পাথরের ভাস্কর্য খুবই আশ্চর্যজনক বটে। চালুক্য (খ্রিস্টীয় ৫৪৩-৭৫৭) ও পল্লব (৪র্থ-৯ম শতাব্দী) রাজবংশের প্রভাব খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে এখনও পর্যন্ত মন্দির ভাস্কর্যে প্রকটিত।

ইতিহাস

মাইসোর (বা মাইসুরু, কন্নড় ভাষায় যথার্থ উচ্চারণ) নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'মহিষ শহর' থেকে, যে নামে আগে কর্নাটককে ডাকা হত। দেবী চামুণ্ডার হাতে মহিষ দানব মহিষাসুরের পতন থেকে শব্দটির উৎপত্তি। মাইসোরের পুরাণেতিহাস কিংবদন্তীতে ঠাসা– যেখানে উত্তরের অবরোধকারী আর্যদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী দ্রাবিড়ীদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুসারে, এটি দেও-দানবের সঙ্গে দেব-দেবীদের লড়াই।

১৯৫৩ সালের আগে অস্তিত্ববান মাইসোর প্রিন্সলি স্টেটের যে দালিলিক ইতিহাস দেখা যায়, তাতে বর্তমান কর্নাটকের অধিকাংশ এলাকায় কন্নড়ভাষী জনগণেরই আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের নেতা অশোকের শাসনের পর যে-সব প্রধান রাজবংশ মাইসোর শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গার কদম্ব রাজবংশ (এঁরা খ্রিস্টীয় ৩য় থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন), বন রাজবংশ এবং পল্লব রাজবংশের বিভিন্ন সামন্ত প্রভুরা (যাঁরা ৪র্থ থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেন)। তুঙ্গভদ্রা নদীর উজানের উর্বরা ভূমি এবং কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী ভূমি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কদম্বদের কাছ থেকে মধ্য কর্নাটকের শক্তিশালী চালুক্য রাজবংশ দখল করে নেন। চালুক্য ও তাঁদের প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকূট রাজবংশ (অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দশম শতাব্দীর শেষ নাগাদ) মালভূমিকে একত্রিত উপকূলীয় সমভূমির অপেক্ষাকৃত নরম ভূমি চাষাবাদ করতে গিয়ে মাইসোরকে সমৃদ্ধ করেন। তবে এঁরা পূর্ব ও দক্ষিণে তামিলদের প্রতিহিংসার শিকার হন। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ হয়সাল রাজবংশ গঙ্গাবদী (তখন মাইসোর এ নামেই কথিত হত) দখল করে নেয়। তবে হয়সালরা চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ দিল্লির সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, মাইসোর ক্রমশ বিজয়নগর রাজ্যের অধীনস্ত হয়ে পড়ে। বিজয়নগরের রাজধানীর নামও ছিল বিজয়নগর। এটি কালক্রমে তৎকালীন কর্নাটকের তুঙ্গভদ্রা নদী তীরবর্তী হাম্পি গ্রামের অংশে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়নগর সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে এবং দক্ষিণে মাইসোরের রাজারা মুঘল শক্তির কাছে পরাভূত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্য ও পশ্চিম-ভারতের মারাঠীদের মধ্যে সংঘর্ষ মাইসোরের ওয়াড়িয়াররা (বা ওড়েয়াররা) লাভবান হয়। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মাইসোরের ওয়াড়িয়ার শাসক সেরিঙ্গপতম (বর্তমান শ্রীরঙ্গপত্তন) অবরোধ করেন; পরে বেঙ্গালোরও (বর্তমান বেঙ্গালুরু) দখল করে ওয়াড়িয়ার শাসন সুসংহত করেন। ১৭০৭ সালে দাপুটে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘলদের অন্তর্কলহের সুযোগে মাইসোরের পরবর্তী শাসকরা তাদের অধিপত্য বিস্তার করেন।

ওয়াড়িয়ারদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজ্যে দুঃশাসন এবং গোটা মালভূমিতে যুদ্ধের ডামাডোলে ১৭৬১ সালে সামরিক অভিযানপিয়াসী হায়দার আলী ক্ষমতা দখল করেন। মালাবার উপকূল ও কর্নাটক মালভূমি তাঁর করতলগত হলে মাইসোরের পরিধি বিস্তৃত হয়। তবে হায়দার আলীসহ স্থানীয় প্রভুরাও ব্রিটিশদের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, যা 'মাইসোরের যুদ্ধ' নামে পরিচিতি। চতুর্থ মাইসোর যুদ্ধে ১৭৯৯ সালে সেরিঙ্গপতমে বর্ণাঢ্য ও শক্তিমান শাসক টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মাইসোর কার্যত ব্রিটিশদের করতলগত হয়।

১৮৩১ থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত মাইসোর শাসন করেন একজন ব্রিটিশ কমিশনার। তিনি ওয়াড়িয়ারদের কাছ থেকে পুনরায় প্রশাসন পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৫৩ ও '৫৬ সালে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের পর শেষ ওয়াড়িয়ার রাজ্যের গভর্নর হন। ১৯৭৩ সালে রাজ্যের নতুন নামকরণ হয় কর্নাটক। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জনতা পার্টি, জনতা দল, জনতা দল (ধর্ম নিরপেক্ষ), ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। • অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

জি কে ঘোরি
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অন্যতম সম্পাদক

মাইসোর রাজপ্রাসাদে আলোকসজ্জা

হেঁসেলঘর

কর্নাটকের সেরা ১০টি প্রথাগত থালি

চিরায়ত কর্নাটক নৈশভোজ পরিবেশিত হয় ঐতিহ্যগত কলাপাতায়, শুরু হয় সুস্বাদু মিষ্টি দিয়ে, শেষ হয় দইভাত দিয়ে। এখানে কর্নাটকের ১০টি ঐতিহ্যবাহী খাবারের বিবরণ পত্রস্থ করা হল:

ওব্বাতু/ হলিজ

ওব্বাতু বা হলিজ কর্নাটকের জনপ্রিয় একটি খাবারের নাম। চানা ডাল ও জাগেরি ময়দার সঙ্গে ভাল করে মাখিয়ে শেষে রোল করে এটি তৈরি হয়। এর সঙ্গে থাকে পরিমাণমত চিনি ও নারকেল কুচি। একে আরও সুস্বাদু করতে সামান্য গরম ঘি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মাখা হয়। উৎসবের সময় এই অতি পছন্দের মিষ্টান্নটি তৈরি করা হয় এবং গরমাগরম পরিবেশন করা হয়।

মাইসোর পাক

মাইসোর পাক মিষ্টি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কর্নাটকের ট্রেডমার্ক মিষ্টি। বাংলা গ্রাম, ঘি, দারচিনি চিনি জলের সঙ্গে গুলে মাইসোর পাক তৈরি হয়। এটি মাইসোর শহরের নন্দিত মিষ্টি। এ সুস্বাদু জিভে জল আনা মিষ্টির ওপর গরম ঘি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আক্ষরিক অর্থে মুখে গিয়ে গলে যায়। এটি কয়েকদিন রাখা যায়– তখন এর স্বাদ ভাল হয়। বিশেষ উপলক্ষ ও উৎসবের সময় মিষ্টান্নটি প্রস্তুত করা হয়।

ইডলি ও উদ্দিনা ভাড়

কর্নাটকের জনপ্রিয় ইডলি ও উদ্দিনা ভাড়ের স্বাদ না নিয়ে কেউ ঘরে ফেরে না। সব হোটেল, এমনকি বাড়িতেও

সকালের জলখাবারে এ স্বাস্থ্যকর খাবার থাকবেই রসনাবিলাসে। সাধারণত ভিজে চাল ও উরাদ ডাল গুঁড়ো ইডলির প্রধান উপকরণ। নানা রকম ইডলি হয়– রাবা ইডলি, থাট্টে ইডলি ও বাটন ইডলি। রাবা ইডলিই সকলের পছন্দ, এটি তৈরি করাও সহজ। ইউলি ও উদ্দিনা ভাড় পরিবেশন করা হয় সম্বরা ও চাটনিসহযোগে। আজকের ক্যালরি-সচেতনতার যুগে ইউলিই সবার পছন্দ এর সহজপাচ্যতার গুণে।

চৌচৌ বাত

চৌচৌ বাত শুনতে হাস্যকর মনে হলেও খেতে নয়। এটি কর্নাটকের দু'টি ঐতিহ্যবাহী জলখাবারের একটি। এটি দ্রুত তৈরি করা যায়। রাবা বা সুজি এর উপকরণ। কেউ কেউ একে উপ্পিটু, আবার কেউ কেউ খেসারি বাতও বলে থাকেন। উপ্পিটু বলা হয় মসলাদার বলে– খেসারি বাত বলা হয় মিষ্টতার জন্যে। এটা ঘি ও বাদাম দিয়ে বানানো হয়। অনেকে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে আনারস যোগ করেন।

দোসা

দোসা দক্ষিণ ভারতীয় জলখাবারের রাজা। বিশেষ করে মচমচে বাদামী মসলা দোসা। চাল ও কালো ডালের সঙ্গে পাস্তুরিত মাখন দিয়ে দোসা বানানো হয়। দোসার ভেতর সম্বরা, চাটনি ও আলু সেদ্ধর পুর দেওয়া হয়। দোসারও প্রকারভেদ আছে– পেঁয়াজ দোসা, রাবা দোসা, রাগি দোসা। কর্নাটকের প্রতিটি বাড়ি ও হোটেলে দোসা থাকবেই।

জলদ রুটি ও আক্কি রুটি

এটি উত্তর কর্নাটকের সবখানে পাওয়া যায়। জলদ রুটিকে জাওয়ার রুটিও বলা হয়, তেমনি আক্কি রুটিকে শুধু রুটিও বলা হয়। বেগুন ভাজা ও কালো চানার ডাল সহযোগে পরিবেশন করা হয়। যদি রুটির সঙ্গে মটরশুটি থাকে তো রুটি হয়ে ওঠে বলবর্ধক। এটা দুপুরের খাবার। রুটি যেহেতু আঁশযুক্ত, তাই ওজন কমানোর জন্যও এটি সবার পছন্দ। এটি খেলে আপনার রক্ত ও কোলেস্টোরেল নিমন্ত্রণে থাকবে।

বিসি বেলে বাত

এই পুষ্টিকর খাবারটি প্রস্তুত হয় চাল, ডাল ও সবজি দিয়ে। রান্নার পর সামান্য ঘি ও মসলাদার আলুর চিপস সহযোগে পরিবেশন করা হয়। বিশেষত শীতকালে ধোঁয়া ওঠা বিসি বেলে বাত স্বর্গীয়! এই জিভে জল আনা সুগন্ধি খাবারটি আমানি কর্নাটকে গেলে খেতে ভুলবেন না।

উড়ুপি সম্বর ও গোজ্জু

ভাত কর্নাটকের প্রধান খাদ্য, তাই সম্বরা ও গোজ্জু প্রতিটি বাড়িতেই রান্না হয়। উড়ুপি সম্বরা হচ্ছে ভাপে সেদ্ধ করা মাংস কুচি, ডাল, টাটকা সবজি সরষের তেল দিয়ে কষিয়ে রান্না করা। স্বাদ বাড়ানোর জন্য শুকনো মরিচ ও কারিপাতা যোগ করা হয়। এখন সম্বর গুঁড়োও পাওয়া যায়।

অপরদিকে গোজ্জু ওকরা, আনারস, কাঁচা আম দিয়ে বানানো হয়। এটি হচ্ছে সহকার খাবার।

রাগিমুড্ডে ও সোপিন্ন সরু

আপনি যদি দুপুরে খাওয়ার সময় গ্রামে কোন বাড়িতে যান তাহলে আপনার জনপ্রিয় রাগি মুড্ডে ও সোপিন্ন সরুতে কামড় দেওয়ার সুযোগ হবে। রাগি খুবই স্বাস্থ্যকর এবং অন্যান্য জোয়ারের তুলনায় দামে সস্তা। একইভাবে জল দিয়ে রাগি মুড্ডে তৈরি করতে আপনার খুব কম সময় লাগবে। সোপিন্ন সরু হচ্ছে ডালের সঙ্গে সবুজ পাতার সবজি মসলা দিয়ে রান্না। এটি মুড্ডের সঙ্গে পরিবেশ করা হয়। এর স্বাদ চমৎকার।

মাদ্দুর ভাড়

কর্নাটকে খুবই জনপ্রিয় একটি জলখাবার হচ্ছে মাদ্দুর ভাড়– সব হোটেল ও বাড়িতে এটি তৈরি হয়। কর্নাটকের খুবই ছোট্ট শহর মাদ্দুর থেকে এর প্রচলন বলে নামই মাদ্দুর ভাড়। গরম ও মচমচে– নারকেলের চাটনি সহযোগে পরিবেশন করা হয়।

- সূত্র ইন্টারনেট

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

শেষ পাতা

রজনীকান্ত সেন

কবি, গীতিকার, সুরকার

কবি, গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতিতে চিরস্মরণীয় রজনীকান্ত সেনের জন্ম ১৮৬৫ সালের ২৬ জুলাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমসাময়িক এই গীতিকারের গানগুলো ভক্তি ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন গুরুপ্রসাদ সেন ও মনোমোহিনী দেবীর তৃতীয় সন্তান। গুরুপ্রসাদ ছিলেন কবি, মনোমোহিনী ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। চারশো বৈষ্ণব ব্রজবুলী কবিতাসঙ্কলনকে একত্রিত করে 'পদচিন্তামণিমালা' নামে একটি কীর্তন গ্রন্থ প্রকাশ করেন গুরুপ্রসাদ। রজনীকান্তের জন্মের সময় তিনি কটোয়ায় কর্মরত ছিলেন। রজনীকান্তর শৈশবে তিনি অনেক জায়গায় চাকরি করেন। ১৮৭৫ সালে বরিশালের সাব-জজ পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করায় পরিবারে অভাব নেমে আসে। এসময় তাঁর আইনজীবী বড়দা গোবিন্দনাথ সংসারের হাল ধরেন।

শৈশবে রজনী ছিলেন খুবই দুষ্টপ্রকৃতির – সবসময় খেলাধূলায় মেতে থাকতেন। তবে তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল আদর্শস্থানীয়। অতিশয় মেধাবী ছিলেন, ফলে পড়াশোনায় বেশি সময় ব্যয় না করলেও পরীক্ষায় আশাতীত ফল অর্জন করতেন। শিক্ষাগুরু গোপালচন্দ্র লাহিড়ীর কাছে বাল্যশিক্ষা এবং প্রতিবেশী রাজনাথ তর্করত্নের কাছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা শেষে রজনীকান্ত বোয়ালিয়া জিলা স্কুলে (বর্তমান রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হন। ১৮৮৩ সালে কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে এফ এ পাশ, কলকাতার সিটি কলেজ থেকে ১৮৮৯ সালে বি এ পাশ এবং একই কলেজ থেকে ১৮৯১ সালে আইন বিষয়ে বি এল ডিগ্রি অর্জন করেন। ইতোমধ্যে ১৮৮৩ সালে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের ছিল চারপুত্র– শচীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, ভুপেন্দ্র ও ক্ষীতিন্দ্র এবং দুই কন্যা– শতদলবাসিনী ও শান্তিবালা। অল্প বয়সে ভুপেন্দ্রর মৃত্যু হলে রজনী দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে পরদিন রচনা করেন এক বেদনাবিধুর গান–

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ,/ তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।/ তোমারি দুনয়নে তোমারি শোক-বারি,/ তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা হা রব।

মা-বাবার সাহিত্যপ্রীতি কিশোর রজনীকান্তের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। স্ত্রীও ছিলেন বিদুষী, তিনি রজনীর কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন। ভাঙ্গাকুঠির তারকেশ্বর চক্রবর্তীর সংগীতসাধনা রজনীর মনে গভীর ছাপ ফেলে। শৈশব থেকেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা লিখতে পারতেন। আর কবিতাগুলোকে গানে রূপ দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান পরিবেশন করতেন। রজনীর কবিতা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তিনি তাৎক্ষণিক গান রচনা করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে পারতেন। এরকম একটি গান রাজশাহী গ্রন্থাগারের সমাবেশে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে রচনা করেছিলেন–

তব, চরণ নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;/ ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা/ সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল-দরশা।

স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর গান ছিল প্রেরণার উৎস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলের জনসভায় বিলাতী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি লেখেন সেই অবিস্মরণীয় গান–

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই;/ দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই–

এই একটি গান রচনার ফলে রাজশাহীর পল্লীকবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি কান্তকবি রজনীকান্ত হয়ে ওঠেন ও জনসমক্ষে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর গান কান্তগীতি নামে অভিহিত হতে থাকে। এ গানটি বাংলায় অদ্ভুত গণ-আন্দোলন ও নবজাগরণের সৃষ্টি করে।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত প্রার্থনাসংগীত–

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে;/ তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক, মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে–

তাঁর গানে ছিল দেশাত্মবোধ, ভক্তি, প্রেম ও হাস্যরসের উপাদান। তবে তাঁর দেশাত্মবোধক গানের আবেদনই বেশি। স্বদেশী কবি হিসেবেও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন রজনীকান্ত। বি এল ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৮৯১ সালে তিনি রাজশাহীতে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁর জ্যেঠামশাই তখন সেখানে প্রাকটিস করতেন। ফলে আইন পেশায় রজনীর দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু আইন পেশার চেয়ে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশি সম্পৃক্ত থাকায় তিনি মক্কেলদের চাহিদামাফিক সময় দিতে পারতেন না। পরবর্তীকালে কিছুদিন তিনি নাটোর এবং নওগাঁ জেলায় অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে কাজ করেন। রজনীকান্ত শারীরিক কসরৎ এবং খেলাধূলায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। গ্রামের নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষা প্রসারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জীবদ্দশায় তাঁর *বাণী* (১৯০২), *কল্যাণী* (১৯০৫) ও *অমৃত* (১৯১০) নামে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরে *অভয়া* (১৯১০), *আনন্দময়ী* (১৯১০), *বিশ্রাম* (১৯১০), *সদ্ভাবকুসুম* (১৯১৩) ও *শেষদান* (১৯১৬) নামে তাঁর আরও ৫টি বই প্রকাশিত হয়।

রজনীকান্তর গান প্রধানত হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীত ঘরানার। এতে কীর্তন, বাউল ও টপ্পার যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সংগীতানুরাগীদের মন জয় করেন।

১৯০৯ সালে তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত হন। ব্রিটিশ ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁর ল্যারিঙ্কস্ ক্যানসার সনাক্ত করেন। তিনি কলকাতার নামজাদা বিভিন্ন ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি। ১৯১০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন ডেনহ্যাম হুয়াইটের তত্ত্বাবধানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর ট্রাকিওটোমি অপারেশন হয়। এতে কিছুটা আরোগ্য মিললেও তিনি চিরতরে বাকশক্তি হারান। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শরৎকুমার রায় তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা করেন। ১৯১০ সালের ১১ জুন রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে দেখতে হাসপাতালে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি এ গানটি রচনা করেন–

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চূর,/ তাই যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছে দূর।/ ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,/ তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছে দীন আতুর।...

গানটি কবিতা আকারে লিখে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হলে কবি ৩০ জুলাই ফিরতি চিঠিতে রজনীকান্তের সাহিত্য প্রতিভা ও গৌরবময় ভূমিকার প্রশংসা করে লেখেন, 'এর মাধ্যমেই তাঁর অন্তরাত্মা শক্তি ও সাহস জুগিয়ে সর্বপ্রকার ব্যথা-বেদনা থেকে তাঁকে মুক্ত রাখবে।' রজনীকান্তের শেষ দিনগুলো ছিল অসম্ভব ব্যথায় পরিপূর্ণ। ১৯১০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় এই ক্ষণজন্মা সংগীতকার পরলোক গমন করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ভারতীয় হাই কমিশনের অনুষ্ঠানমালা

২৭ জুন ২০১৮
ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি) আয়োজিত সংগীত সন্ধ্যায় শ্রী সঞ্জয়কুমার ব্যানার্জি ও শ্রীমতী কেয়া ব্যানার্জির হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশনা

ফুটবলের মাধ্যমে বন্ধুত্ব!
২৯ জুন ২০১৮
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

পর্দার অন্তরালের কর্মীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ!
১৩ জুন ২০১৮
হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ইন্ডিয়া হাউজে বাংলাদেশী নিরাপত্তা ও সহায়তাকর্মীদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra June 2018

বারিধারার কূটনৈতিক জোনে ভারতীয় হাই কমিশনে নবনির্মিত চ্যান্সেরি ভবন

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka